নভেম্বর ২০২২ ▪ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস

নন্দিত নরকে কেন জনপ্রিয় হয়েছিল

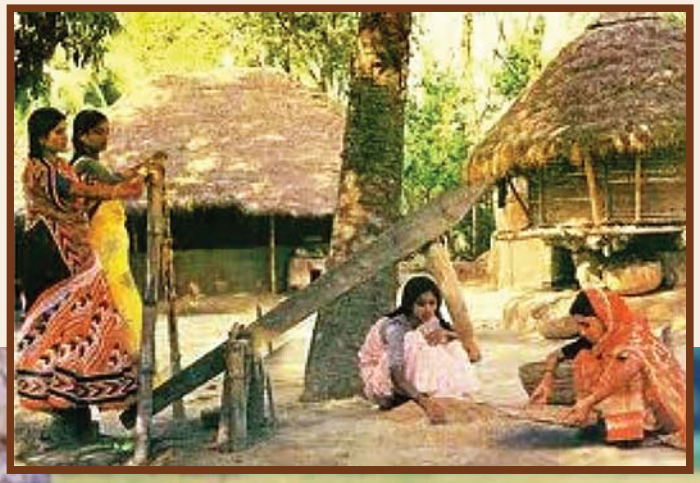

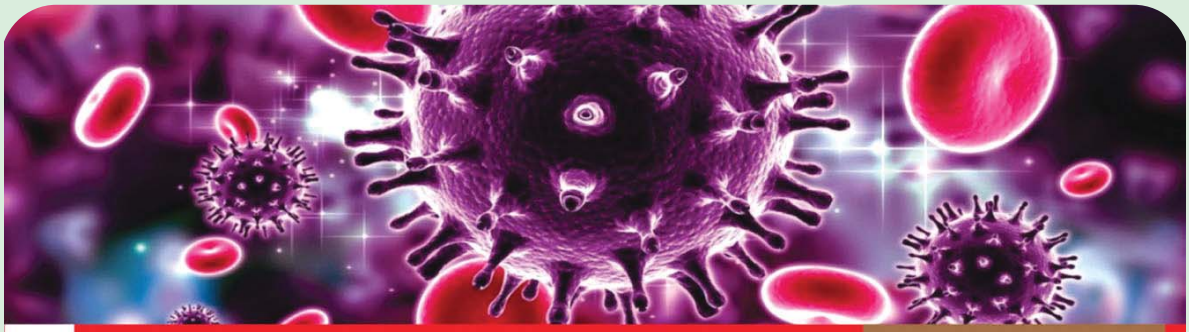

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

নভেম্বর ২০২২ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৯

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা নভেম্বর ২০২২ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জেল হত্যা দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্মরণ সভায় সভাপতির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যাকাণ্ড তেসরা নভেম্বর। বাংলাদেশের ইতিহাসে দুটি শোকাবহ দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে বন্দি, তখন তাঁর বিশাল শূন্যতা পূরণে জাতীয় চার নেতা মূল ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাঁরই নামে ও নির্দেশনায় জাতীয় চার নেতা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁরা সবাই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সহযোদ্ধা ও সুহৃদ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের তেসরা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত হয় ইতিহাসের আরেকটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ যাতে ঘুরে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য বঙ্গবন্ধুর আজীবন রাজনৈতিক সহকর্মী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে জেলখানায় নির্মমভাবে হত্যা করে। মহান এই বীরদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সেই সঙ্গে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। জেল হত্যা দিবসে জাতীয় চার নেতার প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা। জেল হত্যা দিবস নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

১৩ই নভেম্বর ১৯৪৮ সালে জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন নেত্রকোণার মোহনগঞ্জে। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁকে নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

হেমন্ত ঋতুতে ধানকাটার উৎসব দেখা যায় বাংলার ঘরে ঘরে। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাই নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে। নবান্ন ও হেমন্তের প্রকৃতি নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

এছাড়া অন্যান্য নিবন্ধ ও নিয়মিত বিষয় নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* নভেম্বর ২০২২ সংখ্যা। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

জেল হত্যা দিবস: পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যার ঘৃণ্য কাহিনি ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

***নন্দিত নরকে* কেন জনপ্রিয় হয়েছিল** ৭
ড. মোহাম্মদ হাননান

সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল ১৩
মো. আবু নাছের

৩রা নভেম্বর জেল হত্যা: বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তির বিচ্যুতি ১৫
ড. মো. আব্দুস সামাদ

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশের নারীর সম্ভাবনা ১৭
ড. শিল্পী ভদ্র

হেমন্তকাল উৎসবের ঋতু ২১
হাছিনা আক্তার

১০০ সেতু উদ্‌বোধন ২৩

হেমন্ত বাঙালির শস্যের দিন ২৪
ফারুক নওয়াজ

বঙ্গবন্ধুর চেতনায় অর্থনৈতিক মুক্তি ২৬
মো. ইলিয়াজ হোসেন (রানা)

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ২৮
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বাংলা সাহিত্য ও হেমন্ত ঋতু ৩৩
জায়েদুল আলম

নবান্নের বহুমাত্রিক রূপ ৩৬
প্রত্যয় জসীম

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা ৩৮
ইসরাত জাহান

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ৪০
আপন চৌধুরী

নিউমোনিয়া প্রতিরোধে করণীয় ৪২
খালিদ হোসেন

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপ ৪৪
শারমিন ইসলাম

সমবায় পরিক্রমা ও বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ৪৬
প্রশান্ত দে

গল্প

মামলা ৪৮
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

কবিতাগুচ্ছ ৫০-৫২
কামাল বারি, রুহুল গনি জ্যোতি, মঈনুল হক চৌধুরী, শাকিব হুসাইন, সৈয়দ হোসেন, ইমরান পরশ, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, মনির জামান, নীলিম শেখ রাসেল

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫৩
প্রধানমন্ত্রী ৫৪
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫৫
শিক্ষা ৫৬
উন্নয়ন ৫৬
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৭
অর্থনীতি ৫৮
নারী ৫৮
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৯
কৃষি ৫৯
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬০
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৬০
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬১
ক্রীড়া ৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান সাংবাদিক তোয়াব খান ৬৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস

১৯৭৫ সালের পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার তিন মাসের মধ্যেই ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে তেসরা নভেম্বর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী কারাগারে নির্মম হত্যার শিকার হন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধুর বিশাল শূন্যতা পূরণে জাতীয় চার নেতা মূল ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন)। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান সদস্য ছিলেন। জাতীয় চার নেতা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয়ের লাল সূর্য ছিনিয়ে আনেন। জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে 'জেল হত্যা দিবস: পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত ঘৃণ্য কাহিনি' ও '৩রা নভেম্বর জেল হত্যা: বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তির বিচ্যুতি' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা ৪ ও ১৫

নন্দিত নরকে কেন জনপ্রিয় হয়েছিল

হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮-২০১২) প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* প্রকাশের পরপরই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। হুমায়ূন আহমেদের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চরিত্র নির্মাণ। তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকের চরিত্রদের প্রায় সকলেই যেন পরিচিত মানুষ। উপন্যাসে ও নাটকে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো বিশেষ করে 'হিমু', 'মিসির আলী', 'শুভ্র' তরুণ-তরুণীদের কাছে হয়ে ওঠে অনুকরণীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। লেখক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব বিশাল পাঠকসমাজ তৈরি এবং তরুণ প্রজন্মকে বই পাঠে আগ্রহী করে তোলা। তিনি সাহিত্য-সমালোচক এবং পাঠকদের কাছেও শক্তিমান লেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি পাঠককে লেখার জাদুতে মোহিত করে রেখেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর নেত্রকোণায় জন্মগ্রহণ করেন হুমায়ূন আহমেদ। জনপ্রিয় এই লেখকের জন্মদিন উপলক্ষে '*নন্দিত নরকে* কেন জনপ্রিয় হয়েছিল' ও 'হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা ৭ ও ২৮

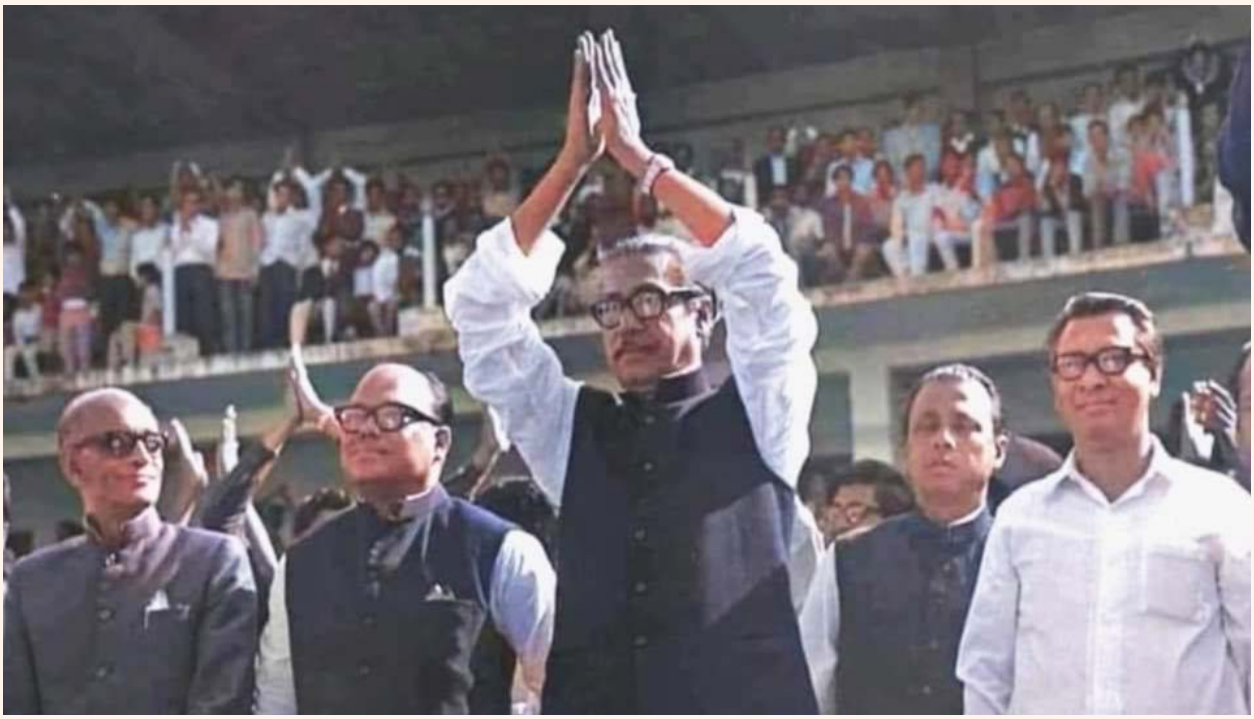

জেল হত্যা দিবস

পনেরোই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যার ঘৃণ্য কাহিনি

খালেক বিন জয়েনউদদীন

বাংলাদেশের কালপঞ্জির ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ১৫ই আগস্টের মতো আরেকটি শোকাবহ দিন। এদিন বঙ্গবন্ধুর খুনিরা জেলখানায় অন্তরিন বঙ্গবন্ধুর সহচর, প্রিয়জন এবং মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় বীর ও সংগঠক জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এদিনটি আমরা জেল হত্যা দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করি এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করি।

জাতীয় চার নেতা ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার গঠন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটান। তাঁরা হলেন: সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। তাঁরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশিত নীতি অনুসরণ করেই মুজিবনগর সরকার পরিচালনা করেন এবং তাঁরা মিত্র রাষ্ট্র ভারতের সর্বপ্রকার সহযোগিতায় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও এদেশীয় দোসরদের পরাজিত করেন এবং বাংলাদেশ স্বাধীন করেন। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য এই জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মাধ্যমে ১৫ই আগস্টের অসমাপ্ত হত্যা সমাপ্ত করা হয় জেলখানায় বন্দি করে। ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বর কোনো বিচ্ছিন্ন তারিখ নয়, একই গ্রন্থিতে বাঁধা ওই দুদিনের ঘৃণ্য ঘটনা যার পরিকল্পক, নির্দেশক ও হত্যাকারী ছিল খুনি মোশতাক, জিয়া, ফারুক, রশিদ, ওসমানী ও মোসলেমউদ্দিন গংরা। বঙ্গভবনে পর্দার পেছনে ছিল তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান। আর দূরে বসে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের মার্কিন বোস্টার, গোলাম আজম চক্র। মূলত একাত্তরের বদলা এবং একাত্তরের চেতনা বিনাশ করতে গভীর ষড়যন্ত্র করে ঐ খুনিচক্র। প্রথমে তারা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর পরিবার, নিকট আত্মীয়স্বজন ও মোহাম্মদপুরের বস্তিঘরে নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায়। আর চূড়ান্তভাবে জেলখানায় হত্যা করে আমাদের জাতীয় চার নেতাকে। খুনি জিয়া ক্ষমতা দখল করে বাংলাদেশে শুরু করে হত্যা-ক্যুর রাজনীতি, যা চলমান ছিল শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট পর্যন্ত।

গোটা বিশ্ববাসী জানে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একাত্তরের স্বাধীনতাবিরোধী পরাশক্তির এদেশীয় কিছু দালাল ও ষড়যন্ত্রকারীরা কিছু বিপথগামী সেনা-মেজরদের দ্বারা আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এদের মধ্যে প্রধান হোতা ছিল খুনি মোশতাক, জিয়া, ফারুক, রশিদ, ডালিম হুদা, নূর মোসলেম চক্র। এরাই মোশতাককে ক্ষমতায় বসায়। আর মোশতাক ক্ষমতায় বসে ওসমানীকে উপদেষ্টা নিয়োগ করে এবং ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত আগস্ট হত্যার ষোলোকলাপূর্ণ করে। এই লোকটি ক্ষমতায় বসে সরকার গঠনের জন্য ফারুক-রশিদকে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের স্টেনের মুখে বঙ্গভবনে নিয়ে আসে। মনসুর আলী বঙ্গভবনে গেলেও মোশতাকের কথায় সায় দেয়নি। অগত্যা তাঁদের প্রথমে ঘরে, পরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বন্দি করে খুনি মোশতাক-জিয়া ও মেজররা। দেন-দরবার চালায় কিন্তু চার নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী তাই তাঁরা মোশতাকের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত নীতিতে

অটুট থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁদের বন্দি করে নেওয়া হয় ঢাকার নাজিমুদ্দীন রোডস্থ পুরানো জেলখানায়। আর এক পর্যায়ে মে. জে. খালেদ মোশাররফ ও সাফায়াত জামিলের ২রা নভেম্বরের ক্যুর রাতে ওই খুনিচক্র সরাসরি নির্দেশ দিয়ে মোসলেমউদ্দিনকে পাঠায় জেলখানায় হত্যার জন্য। এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পরই ক্যুর কারণে মোশতাক অপসারিত হয়। খুনি মেজররা পালিয়ে যায় সিঙ্গাপুর। জিয়া বন্দি হয়ে স্বীয় পদ থেকে পদত্যাগ করে। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন বিচারপতি সায়েম আর সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ।

জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ৪৭ বছর হলো। আমরা অনেকেই ভুলে গেছি ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের পটভূমি ও ইতিহাস। ১৯৯৮ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রকাশিত হয় হত্যা মামলার চার্জশিটের বিবরণ। বিবরণটি এরকম–

> ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর রাত ৪টা থেকে ৫টা ৩৫ মিনিটের মধ্যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। এসময় হত্যাকারীরা দু'বার কারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তারা গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে চার নেতাকে। ১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর রাত পৌনে ২টার সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে জলপাই রঙের একটি জিপ এসে থামে। জিপ থেকে নেমে আসে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র চার সদস্য। এদের একজন রিসালদার মোসলেম জিপ থেকে নেমে এসে কারাগারের জেলারকে জানান ফারুক-রশিদ তাদের পাঠিয়েছে। তারা জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে নিয়ে যেতে চায়। ডিআইজি প্রিজন কাজী আবদুল আওয়াল এতে খুব ভয় পেয়ে যান। তিনি এটা জেল কোডের পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু রিসালদার মোসলেম নাছোড়া। তিনি বঙ্গভবনে ফোন করেন। কর্নেল রশিদ ফোন ধরে মোশতাককে দেন। খোন্দকার মোশতাক ডিআইজিকে কর্নেল রশিদের কথামতো কাজ করার হুকুম দেন। এই হুকুমের ফলে কারাগারে প্রবেশের অধিকার পেয়ে যায় চার ঘাতক। তাজউদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন নিউ জেল (কেন্দ্রীয় কারাগার-এর) ১ নম্বর সেলে। পরবর্তী সেলে ছিলেন মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান। তাঁদের সবাইকে জড়ো করা হয় তাজউদ্দীনের সেলে। এরপর খুব কাছ থেকে তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান। তাজউদ্দীনের পেটে ও হাঁটুতে গুলি লাগে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণেও তিনি দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকেন। তাজউদ্দীন বেঁচে আছেন বিষয়টি এক কারাবন্দি দেখতে পায় এবং ঘাতকদের একথা বলে। ঘাতকরা একথা শোনার পর সেলের মধ্যে প্রবেশ করে পুনরায় বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চার নেতার হত্যা নিশ্চিত করে চলে যায়। তারা কারাগারে প্রবেশ করে রাত ৪টায় আর বের হয় ৫টা ৩৪ মিনিটে। এই দীর্ঘ সময়ে ঘটানো হয় হত্যাকাণ্ডটি। নির্বিঘ্নে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে যায় ঘাতক দল। মধ্যরাতে কারা অভ্যন্তরে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটলেও বাইরের পৃথিবীর কেউ তা জানত না। এমনকি সেলের মধ্যেই সকাল ১০টা পর্যন্ত লাশগুলো তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। সকাল ১০টার পর কেন্দ্রীয় কারাগারের চিকিৎসকরা সেলে প্রবেশ করে। সেলের মধ্যেই লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করেন ম্যাজিস্ট্রেট আজমল হোসেন চৌধুরী ও মিজানুর রহমান। এরপর ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন সিভিল সার্জন ডা. ফয়েজউদ্দিন মিয়া ও কারা ডাক্তার রফিক উদ্দিন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ডা. পোদ্দার ও ডা. মনোয়ার উল্লাহ। তাঁদের ময়না তদন্ত ও সুরতহাল রিপোর্টে বলা হয়, গুলিবর্ষণ করে ও বেয়নেট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

১৪১৭ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ পুরানো কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন বঙ্গবন্ধুকন্যা ও লোকলক্ষ্মী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিছু সময়' শীর্ষক একটি রচনা লেখেন। এই রচনাটিতে তিনি জেল হত্যা, তাঁর বিয়ের পরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কারাগারের পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে রচনাটির কিছু অংশ উল্লেখ করছি–

> আমরা এখান থেকে গেলাম জাতীয় চার নেতাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সেই জায়গায়। সেখানে হেঁটেই গেলাম। আব্বার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও কামারুজ্জামান। এই চার জনকে ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ সালে কারাগারে বন্দি অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করে। কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে ঢুকে হত্যা করার ঘটনা সভ্য জগতে বোধ হয় এই প্রথম। বাইরে থেকে অস্ত্রধারীরা ঢুকে একের পর এক হত্যা করে

এই চার নেতাকে। এখানে বেদিতে ফুল দিলাম। চারটা স্তম্ভে চার জনের ভাস্কর্য করা হয়েছে। পানির ফোয়ারার ভেতরে এই ভাস্কর্যগুলো তৈরি করা হয়েছে। এখনো গরাদে বুলেটের চিহ্ন রয়ে গেছে। দেয়ালের গায়ে যে বুলেটের চিহ্ন ছিল তা মেরামত করা হয়েছিল বহু আগেই। সে চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাজউদ্দীন সাহেবের দুই মেয়ে রিমি ও মিমি, মনসুর আলী সাহেবের ছেলে মো. নাসিম এবং কামারুজ্জামান সাহেবের ছেলে রাজশাহীর বর্তমান মেয়র লিটন উপস্থিত ছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তাজউদ্দীন সাহেব প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। প্রতিটি সংগ্রামে অংশ নিয়ে জেলজুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করেছেন। এই মুক্তিযুদ্ধের বিজয়টা ঘাতকের দল মেনে নিতে পারেনি। যে কারণে পরিকল্পিতভাবে ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করে আর ৩রা নভেম্বর জেলখানায় হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির দালালরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এই জিঘাংসা চরিতার্থ করে। জাতি চিরদিন এই খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের ঘৃণা করে যাবে।

সেখান থেকে ফেরার পথে মহিলা ওয়ার্ডে গেলাম। সাজেদা চৌধুরী, মতিয়া চৌধুরী, দীপ্তি আমার সঙ্গে ছিল। অনেকেই এই কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছে। তাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কারারক্ষী যেসব সাবজেলে আব্বার ডিউটি করেছে তাদের সঙ্গেও দেখা হলো। সেখান থেকে গেটে আসলাম। যে কামরায় বসতে দিল এই কামরায় আব্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।

১৯৬৭ সালের ১৭ই নভেম্বর আমার আকদ হয় ড. এম এ ওয়াজেদের সঙ্গে। কয়েকদিন পর ইন্টারভিউ অনুমতি পেলে মা আমাকে ও ড. ওয়াজেদকে এখানে নিয়ে আসেন। জেলখানার ফুল দিয়ে আব্বা দুটো মালা তৈরি করেন। বিয়ের প্রথম ফুলের মালা আব্বার হাত থেকে পেলাম। আব্বা মালা পরিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেন এই কামরায়। সেই জায়গায় আজ এসে বসলাম।

এক হাজার বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে সেই ঘোষণা দিলাম। বের হওয়ার পথে দেখতে গেলাম অন্য একটি কামরা। সেখানে সব সময় আব্বার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতো। অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। পাশের কামরায় পেলাম সেই টেবিলটা। গোল গোল পায়া দেওয়া একটা টেবিল। আমরা ছোটবেলায় ওই টেবিলে পা ঝুলিয়ে বসতাম। জামাল খুব ছোট ছিল, ওই টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলে খেলা করত। এরপর রেহানা এল আমার মায়ের কোলজুড়ে। রেহানাও খেলা করেছে ওই টেবিলে। কারণ আব্বা তো বার বারই জেলে বন্দি হয়েছেন। এরপর ছোট্ট রাসেল এল আমার মায়ের কোলে। আমাদের সবার আদরের ছোট্ট রাসেলও ওই টেবিলে বসে খেলা করেছে। পেছনে টিনের শেড দেওয়া বারান্দা এখনো ওইরকমই আছে। আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম, কখন আব্বা আসবেন। কারণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো। জেলগেটে আসার পর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। অনুমতি এলে ভেতরে গিয়ে বসতাম। আমাদের ভেতরে বসিয়ে তারপর আব্বাকে আনতে যেত। মাত্র আধঘণ্টার জন্য দেখা পেতাম। এর বেশি অনুমতি ছিল না। মা ফ্লাস্কে করে চা বানিয়ে নিয়ে যেতেন, সঙ্গে কিছু নাশতা। আমরা যেখানে বসতাম, সেখানেও দুজন গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত থাকতেন। কী কথা হয় না হয়। বোধ হয় তা ওপরে জানানোর কাজই তাদের ছিল। বিকাল ৫টা থেকে প্রায় পৌনে ৭টা পর্যন্ত কারাগারে ছিলাম। সব বন্দির জন্য বড়োখানা দেওয়ার নির্দেশও দিয়ে এলাম।

পুরানো কারাগারের যে কক্ষগুলোয় জাতীয় চার নেতা থাকতেন সেখানে স্মৃতিকক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বসানো হয়েছে জাতীয় চার নেতার ভাস্কর্য।

১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বর এলেই মনে পড়ে শোক ও বেদনার কথা। আবার বলতেও ইচ্ছে করে সেই খুনিরা কে কোথায়? কেউ কেউ ফাঁসির দণ্ড পেয়েছে, ফাসির রজ্জু গলায় পরেছে। পালিয়ে আছে কেউ কেউ। আর চাষী জ্বলন্ত গাড়িতে পুড়ে মরুময় সৌদিতে মারা গেছে। ঠাকুর কবে, কোথায় মারা গেল, তা কেউ বলতে পারে না। প্রকৃতির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না। আর সময় ও ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না। বিধাতার বিচারে তারাই বিনাশ হয়েছে।

বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ– এই কথাটি আমরা জোর গলায় বলতে পারি। আর সংগ্রাম ও আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বটির নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। তাঁদের আত্মত্যাগের ফলেই আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের বাংলাদেশ। বাঙালির ইতিহাসে তাঁদের অমলিন কীর্তিগাথা চিরকাল জ্বলজ্বল করবে। আমরা তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

তথ্যসূত্র

* *সচিত্র বাংলাদেশ*, নভেম্বর ২০১৭

* *সচিত্র বাংলাদেশ*, নভেম্বর ২০১০

* *একটি রক্তাক্ত দলিল*, মাসকারেনহাস, রুপান্তর

* *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, সম্পাদনায়: মোনায়েম সরকার, বাংলা একাডেমি

* *ভারতবর্ষ ও স্বশাসন*, শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা একাডেমি

* *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম*, লে. ক. আবু ওসমান চৌধুরী

* *জেল হত্যাকাণ্ড*, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

খালেক বিন জয়েনউদদীন: বঙ্গবন্ধু গবেষক ও ফেলো, বাংলা একাডেমি

নন্দিত নরকে কেন জনপ্রিয় হয়েছিল

ড. মোহাম্মদ হাননান

হুমায়ূন আহমেদের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে*। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত ১৯৭২ সালে, প্রকাশনা সংস্থা খান ব্রাদার্স থেকে। এর আগেই *মাসিক মুখপত্র* নামে একটি সাহিত্য সাময়িকীতে *নন্দিত নরকে* প্রকাশিত হয়েছিল। এর রচনাকাল ১৯৭০ সাল। ১৯৭২ সালে সাময়িকীতে প্রথম প্রকাশের পরই তা পাঠক মহলে নন্দিত হয়েছিল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ শরীফ প্রকাশিত গ্রন্থে একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। একটি উপন্যাসের ভূমিকা ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন, এখবরও পাঠকমহলে বিস্ময় জাগায়। কারণ ড. শরীফ বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও তিনি ছিলেন সাহিত্যের পণ্ডিত শ্রেণির লোক। গল্প-উপন্যাস তিনি পড়েন এটাই একটা 'খবর' হয়। আর তাঁর মন্তব্য, 'ভবিষ্যতে তিনি (হুমায়ূন আহমেদ) বিশিষ্ট জীবন শিল্পী হবেন'–একথা সত্য হবে, কে সে সময় তা ভাবতে পেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে *নন্দিত নরকে*'র সকল পাঠকই প্রথম দিন থেকে বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আগমন ঘটেছে।

কড়া নাড়লেন হুমায়ূন আহমেদ

কী ছিল *নন্দিত নরকে* উপন্যাসে যে হুমায়ূন আহমেদকে ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেললেন। এ ঘটনার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা যুগপৎ গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। ১৯৭০ সাল, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি চলছে। নতুন দেশ হবে। নতুন পতাকা আর নতুন জাতীয় সংগীত তৈরি হয়ে গেছে। বাঙালির সাহিত্য-জিগীষাও তখন অপেক্ষিত। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য বিপরীত স্রোতে থেকেও ছিল সমুজ্জ্বল। তথাপি বাঙালি পাঠক তখনও ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যমুখী। কলকাতার প্রথম শ্রেণি থেকে বটতলার সাহিত্য পর্যন্ত সবই পাওয়া যেত ঢাকার ফুটপাতে। বাঙালি পাঠক গ্রোগ্রাসে গিলত সেসব উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট সবই। হুমায়ূন আহমেদের *নন্দিত নরকে* এখানটায় কড়া নাড়ল। তাঁর কড়ার আওয়াজটা ভালো করেই বাজল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা উচ্চকিত ছিল। বাঙালি পাঠক ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্যে নজর দিলো। হুমায়ূন আহমেদ বাংলা ভাষার যুগপৎ জনপ্রিয় এবং প্রিয় লেখক হলেন। একটা বিশাল এবং সক্রিয় পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হলো, যারা ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের সমঝদার পরিণত হলো। ফুটপাতের লেখক ও তাদের তথাকথিত সাহিত্য থেকে বাঙালি মুক্তি পেল। এর সবকিছুরই বুনিয়াদ হয়েছিল *নন্দিত নরকে*।

হাতে *নন্দিত নরকে* নামক পতাকা

বাংলাদেশ তখন সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। তার রাজধানী ঢাকা এতদিন ছিল প্রাদেশিক রাজধানী। কিন্তু তখনও ঢাকা একটি আঞ্চলিক শহরই। ঢাকার কোনো আন্তর্জাতিক মর্যাদা তখনও গড়ে উঠেনি। ১৯৪৭-পূর্বে সবই হতো কালকাতার নামে, ১৯৪৭-এর পরে সবই হয়েছে করাচি কিংবা ইসলামাবাদের সূত্রে। ঢাকা স্বকীয়তায় কখনোই দাঁড়াতে পারেনি। সেদিন যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, ঢাকা তার প্রথম রাজধানী। ঢাকা এখন সব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে সরগরম। ঢাকা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব দেবে। প্রেক্ষাপটেই হুমায়ূন আহমেদের আবির্ভাব, হাতে তাঁর পতাকা *নন্দিত নরকে*।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের বীজ রোপিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই আগত প্রথম *নন্দিত নরকে* উড়িয়ে দিলেন।

সদ্য স্বাধীন বাঙালি পাঠক তার ঘ্রাণের আস্বাদন গ্রহণ করল। বাঙালি মধ্যবিত্তের পারিবারিক-সামাজিক আখ্যান হয়ে থাকল না *নন্দিত নরকে*, এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারারও প্রবর্তন হলো। মধ্যবিত্তের পারিবারিক যন্ত্রণা, তার কষ্ট, অসহায়ত্ব পুরোটাই *নন্দিত নরকে* ধারণ করল। ক্ষুদ্র পরিসরের উপন্যাস হয়েও *নন্দিত নরকে* হলো মহাকাব্য। এতদিন অপেক্ষিত ছিল যা, হুমায়ূন আহমেদ তা পূরণ করেছিলেন।

নগর চরিত্রে স্বল্প পরিসর তত্ত্ব

ঢাকা তখনও রীতিমতো শহরই। নতুন একটি দেশের রাজধানী হওয়ার কারণে নগর চরিত্রের অনেক কিছুই তখন ছুঁই ছুঁই করছিল। এর একটি ছিল নগরের মানুষের কর্মব্যস্ততা অথবা অন্য আরও কিছু। নগর মানুষের এখন আর অঢেল সময় নেই যে সে তখন বিশাল উপন্যাস কড়ি দিয়ে কিনলাম পড়বে। গত শতকের আশির দশকে *যায়যায় দিন* নামে একটি *সাপ্তাহিক পত্রিকার* কলেবর এতটা ছোটো হয়েছিল যে, নগরের মানুষ তার হাজারো রকম

ব্যস্ততার মাঝেও একটি পত্রিকা পড়বে, যখন বাসে চড়বে অথবা রেলগাড়িতে উঠবে কিংবা যখন লঞ্চে নদী পাড়ি দেবে। এর দামও রাখা হয়েছিল খুব কম, মাত্র 'দুইটাক্কা'। বাস-লঞ্চ-রেলগাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার সময় এটা সে বসার আসনে ফেলেও যেতে পারে; হাতে করে নিয়েও যেতে পারে। এ হলো নগর চরিত্র। ইউরোপ-আমেরিকায় যানবাহনের সিটে এরকম অনেক বই ও পত্রপত্রিকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ নগর চরিত্রের এ চাহিদা ও সরবরাহের তাত্ত্বিক ভিত্তিকেও *নন্দিত নরকে* পূরণ করল স্বল্প পরিসরের কাঠামো দিয়ে।

নন্দিত নরকে-র সবচেয়ে শক্তিশালী দিক ছিল এর সহজ-সরল ভাষা। এমন একটা গদ্যভঙ্গিমা হুমায়ূন আহমেদ এ উপন্যাস রচনার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, যা পাঠককে দম নিতে দেয় না। 'গ্রোগ্রাস' কথাটা খাওয়ার বেলায়ই প্রযোজ্য হয়, পড়ার বেলায় নয়; তবু বলব, পাঠককে *নন্দিত নরকে* পড়তে হয় গ্রোগ্রাসেই, একটুও না থেমেই, কোনোদিকে না তাকিয়েই, দম ফেলার ফুরসতটুকুও পায় না সে। এমন একটি গ্রন্থেই সেদিন মেতে উঠেছিল বাংলা ভাষার পাঠক। বহুদিন তারা অপেক্ষা করেছিল এমন একটি মুহূর্তের জন্যই। হুমায়ূন আহমেদ নীরবে ঢাকটি বাজিয়ে দিলেন।

সকল পাঠকের জীবনকাহিনি

প্রথম লাইন থেকে শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত পাঠককে যেতে হয় গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে, উপন্যাসটি বাঙালি মধ্যবিত্তের। মনে হয় যেন এটা আমারই জীবনের ঘটনা। আমারই পরিবারে একে একে ঘটেছিল ঘটনাগুলো। বুক দুরুদুরু করতে থাকে 'আমি' নামক হুমায়ূনের যেমন, তেমনি পাঠকেরও। ফলে এ উপন্যাস হয়ে পড়েছিল সকল পাঠকেরই জীবনকাহিনি। *নন্দিত নরকে* তাই বহুল পঠিত হয়েছে সকল পাঠকের জীবনে অনেকবার।

চিত্ররূপময় কথাসাহিত্য

একজন পাঠক কেন একটি বই বার বার পড়বে! যখন সে দেখে উপন্যাসের কাহিনিতে ছড়িয়ে আছে তার নিজের জীবনেরই ছবি। যে চিত্রগল্পগুলো লেখক উপন্যাসের গল্পটি ফুটিয়ে তুলতে এঁকেছেন তখন পাঠক তার নিজের একান্ত চারপাশটা দেখতে পায় :

> ১. রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখলাম তার ফরসা কান লাল হয়ে উঠেছে। সে তার জ্যামিতি খাতায় আঁকিবুকি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'দাদা, একটু পানি খেয়ে আসি' বলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল। [*নন্দিত নরকে*, হুমায়ূন আহমেদ রচনাবলী, খণ্ড: ১, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃষ্ঠা: ১৯]

'ফরসা কান লাল হয়ে' যাওয়াটা আমার পুরোপুরিই অনুভব করতে পারলাম, কারণ এটা তো আমার ছোটোবোনের মধ্যেই আমরা দেখেছিলাম। দৃশ্যটা পাঠকের কাছে খুব পরিচিত হয়ে উঠল। অন্যত্র,

> ২. মা রাবেয়ার পাশে বসে রাবেয়ার মাথায় হাত রাখলেন। আমি একটি ছোট কিন্তু স্পষ্ট দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনলাম।... রাবেয়া হয়তো ঠিক রূপসী নয়। কিংবা কে জানে হয়তো রূপসী। হালকা কালো। বড় বড় চোখ, স্বচ্ছ দৃষ্টি, সুন্দর ঠোঁট। হাসলেই চিবুক আর গালে টোল পড়ে। যেসব মেয়ে হাসলে টোল পড়ে তারা কারণে-অকারণে হাসে। তারা জানে হাসলে তাদের ভালো দেখায়। [*নন্দিত নরকে*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা: ২২-২৩]।

তরুণ-যুবক পাঠককে রোমান্টিকতায় উসকে দিতে এ বর্ণনার জুড়ি নেই। হুমায়ূন আহমেদ প্রথম দিনই জানতেন এ শ্রেণির পাঠককে কেমন করে গল্পে বশীভূত করতে হবে। পাঠক এ বর্ণনায় লা-জবাব। নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরাই ছিল লেখকের টার্গেট। তাদেরই তিনি ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর সবিশেষ বর্ণনায় সেসবের আভাস রয়েছে:

> ৩. রুনুর বয়স এখন তেরো। আগামী নভেম্বরে চৌদ্দতে পড়বে। রুনুর বৃশ্চিক রাশি। আমার যখন এমন বয়স ছিল তখন এ ধরনের কথা শুনে বেশ লাগত। সেই বয়সে মেয়েদের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগত। টগর ভাইয়ের বাসায় সন্ধ্যাবেলা অঙ্ক বুঝতে যেতাম। নিলু বলে তার একটা ছোট বোন ছিল। বড় হয়ে এই মেয়েটিকে বিয়ে করব ভেবে বেশ আনন্দ হতো আমার। নিলুর সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা লাগত, কথা বেধে যেত মুখে। নিলু যখন আমার হাত ধরে টেনে বলত, 'আসুন-না দাদুভাই লুডু খেলি' তখন অকারণেই আমার কান লাল হয়ে উঠত। গলার কাছটায় ভার-ভার লাগত। [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা: ২৩]।

তাঁর চিত্রল বর্ণনা ঘটনাকে ঋজু ও অনিন্দ্য করেছে। প্রায় সবক্ষেত্রেই এটা ঘটেছে:

> ৪. আজ এই আশ্বিনের মধ্যরাত্রি, কাকা বসে আছেন ঠান্ডা মেঝেতে। অল্প অল্প শীতের বাতাস বইছে। জোছনা ফিকে হয়ে এসেছে। এখনি হয়তো চাঁদ ডুবে চারদিক অন্ধকার হবে। আমার সেই পুরনো কথা মনে পড়ল। [পৃষ্ঠা: ৩৪]

তবে তাঁর চিত্রময় বর্ণনা সর্বত্রই সহজ-সরল বাক্যযোগে একজন সাধারণ পাঠকও তা অনুধাবন করতে পারবে:

> ৫. কাক ডাকল। ভোর হচ্ছে বুঝি। কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আজান হলো। মাঠের ওপারে ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের জমাটবাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। বাঁশের বেড়ার উপর হাত রেখে নাহার ভাবি খালি পায়ে ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। [পৃষ্ঠা: ৩৭]

একটি গ্রামীণ পরিবেশের চিত্রকল্প। কোমল একটা আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে 'বাইরে এসে দাঁড়াতেই আজান হলো', একটি অর্থবোধক হুমায়ূনীয় রীতি, বাংলা সাহিত্যে বিরল। অন্যত্র আরও একটি চিত্ররূপময় বর্ণনা :

> ৬. রুনু লম্বা হয়েছে একটু, চোখের তারাও যেন মনে হয় আরো গভীর কালো। চাঞ্চল্যও এসেছে একটু। সেদিন দেখলাম অনেকক্ষণ ধরেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ালো। সে কি বুঝতে পারছে তার চোখের পাতায়, তার হলুদ গালে, বরফি কাটা মসৃণ চিবুকে রূপের বন্যা নামছে। যৌবনের সেই লুকানো চাবি দিয়ে প্রকৃতি একটি একটি করে অজানা ঘর খুলে দিচ্ছে তার সামনে। [পৃষ্ঠা: ৩৯]

একজন বৃদ্ধার বা বয়সি নারীর চিত্র এঁকেছেন তিনি, যাকে পছন্দ না হলেও কল্পনার প্রেয়সীর মা বলে সমীহ করতে হচ্ছে, এমন একটি বাস্তবতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এমনভাবে:

> ৭. শীলুর মা মালপত্র নামাতে নামাতে আড়চোখে

তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। বুড়ো বয়সেও ঠোঁটে আর মুখে রং মেখেছেন। বয়স অগ্রাহ্য করে পরা চকচকে শাড়িতে তাঁকে হাস্যকর লাগছিল, কিন্তু তবু তিনি শীলুর মা, আমি বিনীত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। [পৃষ্ঠা: ৪১]

অথচ অপ্রকৃতিস্থ অসুস্থ রাবেয়াকে যখন তিনি পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন তখন বর্ণনার লালিত্যে সে আমাদের ভালোবাসা ও মায়ার অনুভূতিতে চলে আসে :

৮. রাবেয়া পরেছে বেশ দামি আসমানি রঙের শাড়ি। সাধারণ সাজগোজের বেশি কিছু করেনি। এতে তাকে যে এত সুন্দরী লাগবে কে ভেবেছে। বড় বড় ভাসা চোখ, বরফি কাটা চিবুক, শিশুর মতো চাউনি। সব মিলিয়ে রূপকথার বইয়ে আঁকা বন্দি রাজকন্যার ছবি যেন। [পৃষ্ঠা: ৪৪]

ভাষার লালিত্য

যখন রাবেয়াকে একটা অপ্রাকৃত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় তখনও লেখকের কলমকে অসাধারণত্বে ঝলসে উঠতে দেখি:

১. গত বৎসর আমরা বড় খালার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বড় খালার মেয়ে নিনাও এসেছিল মায়ের কাছে। প্রথম পোয়াতি মেয়ে। মা নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে। নিনা আপা কি প্রসন্ন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। প্রথম সন্তান জন্মাবে তার, কী প্রগাঢ় আনন্দ চোখে মুখে। 'যদি ছেলে হয় তবে নাম দেব কিংশুক, মেয়ে হলে রাখী'। হেসে হেসে বলে উঠেছিলেন নিনা আপা। আর তাতেই উৎসাহিত হয়ে রাবেয়া বলেছিল, 'আমিও আমার ছেলের নাম কিংশুক রাখব।' আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রাবেয়া, নীল রঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে তুই শুয়ে আছিস। হলুদ রোদ এসে পড়েছে তোর মুখে। কিংশুক নামের সেই ছেলেটি তোর বুকের সঙ্গে মিশে গেছে। যে বুক একটু আগেই খালি খালি লাগছিল। [পৃষ্ঠা: ৫২]

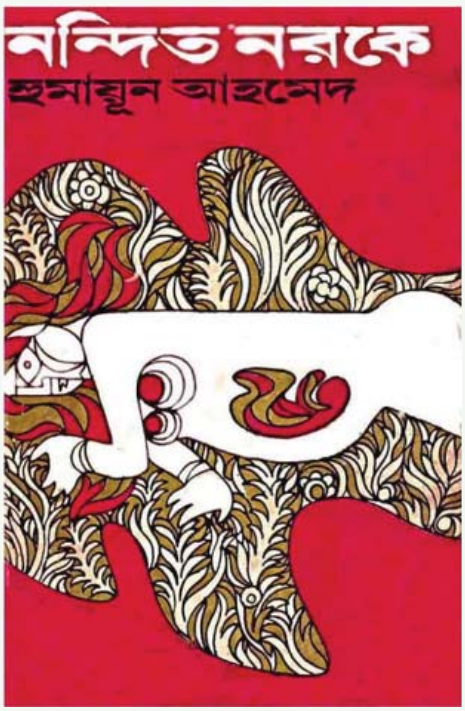

এভাবে বেদনার চিত্র আঁকতে এবং এঁকে পাঠককে কাঁদাতে হুমায়ূন আহমেদের জুড়ি নেই :

২. সারা রাত খুব বৃষ্টি হলো। আষাঢ়ের আগমনী বৃষ্টি। বৃষ্টিতে সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। রুনু বলল, মনে আছে দাদা, এক রাতে এমনি বৃষ্টি হয়েছিল। তুমি একটা ভূতের গল্প বলেছিলে।

আমি কথা বললাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে হারিকেনের শিখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাবা হঠাৎ করে বিকৃত গলায় ডাকলেন, খোকা, ও খোকা।

কী বাবা ?

আয়, তুই আমার কাছে আয়। মন্টুর জন্য বুকটা বড় কাঁদে রে। তিমিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠল। [পৃষ্ঠা: ৬২]

ভাষার প্রয়োগ ও গাঁথুনি, শ্লীল-অশ্লীল বিবেচনায় হুমায়ূন বিশ এবং একুশ শতকে অনন্য এবং একা। তাঁর ভাষা সচেতনতা লক্ষযোগ্য, যা অনুপ্রাণিত করে বোদ্ধা পাঠককে:

৩. রাবেয়া ঘুমের ঘোরে পা তুলে দিয়েছে রুনুর গায়ে। বেশ স্বাস্থ্য রাবেয়ার। স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের হয়তো ভরাযৌবনের মেয়ে বলে। ভরাযৌবন কথাটায় কেমন একটা অশ্লীলতার ছোঁয়া আছে। আমার কাছে যুবতী কথাটা তরুণীর চেয়ে অনেক অশ্লীল মনে হয়। কে জানে কেন! [পৃষ্ঠা: ৬]

অশ্লীল হতে পারে, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ সেখানে কত মার্জিত ও শ্লীল, তা বিবেচনায় নিলে মুগ্ধ হতে হয় :

৪. দেশলাই জ্বালাতেই চোখে পড়ল রাবেয়া বিশ্রীভাবে শুয়ে রয়েছে। প্রায় সমস্তটা শাড়ি পাকিয়ে পুঁটলি বানিয়ে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। শীতের সময় মশা থাকে না, মশারির আব্রুও সেই কারণেই অনুপস্থিত। [পৃষ্ঠা: ২০]

মা-বাবার একটা একান্ত শারীরিক সম্পর্কও তিনি পাঠককে জানিয়ে দিতে পারেন কোনো প্রকার কুৎসিত দৃশ্য রূপায়ণ ছাড়াই। সমগ্র বিশ্বসাহিত্য ধরেই বলাই যায় নজিরবিহীন:

৫. ...আশ্চর্য। বাবা এমন আদুরে গলায় ডাকতে পারেন। আমার লজ্জা করতে লাগল। বাবা আবার ডাকলেন,

শানু শানু।

শাহানা নামটাকে কি সুন্দর করে ভেঙে শানু ডাকছেন বাবা।... [পৃষ্ঠা: ২১]

ভাষার ওপর তাঁর দখল ছিল তুলনা রহিত। বাংলা সাহিত্যে এতটা সংযত এবং সংহত ভাষাশৈলী আমরা খুব কমই দেখতে পাই। অপ্রয়োজন অশ্লীল দৃশ্য স্থাপন এবং খোলামেলাভাবেই অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে পাঠক ধরে রাখার যে অপপ্রয়াস বাংলা কথাসাহিত্যে চলছে, তা গত দুই শতক ধরে এক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যৌনদৃশ্য রূপায়ণের প্রতিযোগিতাও চলে এদের মধ্যে। হুমায়ূন আহমেদ এ দুশতকের বিশ শতকের শেষ পাদে এবং একুশ শতকের প্রারম্ভে সমানতালে লিখে গেলেও তাদের থেকে স্বতন্ত্র। অসুস্থ রাবেয়ার শরীরে অবৈধ সন্তান এসেছে, এটা লেখক প্রকাশ করেছেন মমতাহীনভাবে, কিন্তু সৌকর্য ভাষা প্রয়োগে:

৬. ব্যাপারটা আমি জানলাম, রুনু জানল, মন্টু ফুটবল খেলতে বাইরে গেছে, শুধু সেই জানল না। রাবেয়ার নির্বিকার ঘুরে বেড়ানোর ফল ফলেছে। ডাক্তার তাকে পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন। এখন রাবেয়ার প্রয়োজন শুধু বিশ্রাম।

রাবেয়ার মাথার ঠিক নেই। ছোটবেলা থেকেই সে ঘুরে বেড়াত চারদিকে। সব বাড়িঘরই তার চেনা। চাচা খালু দাদা বলে ডাকে আশপাশের মানুষকে। তাদের ভেতর থেকেই কেউ তাকে ডেকে নিয়েছে। এমন একটি মেয়েকে প্রলুব্ধ করতে কি লাগে?

মার রাত্রে ঘুম হয় না। তার চোখের নীচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। রুনু আর শীলুদের বাসায় গান শুনতে যায় না। নাহার ভাবি বেড়াতে এসে বললেন,

কী ব্যাপার তোমরা কেউ দেখি আমাদের ওখানে যাও না, রাবেয়া পর্যন্ত না।

রুনু কথা বলে না। মা নিচু গলায় বলেন, রাবেয়ার অসুখ করেছে মা।

কী অসুখ, কই জানি না তো?

এমনি শরীর খারাপ।

বলতে গিয়ে মায়ের কথা বেঁধে যায়। অসহায়ের মতো তাকান।

ব্যাপারটার উৎস রাবেয়ার কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করলাম আমি। সন্ধ্যায় যখন রুনু মাস্টার কাকার কাছে পড়তে যায়, ঘরে থাকি আমি আর রাবেয়া, তখনই আমি কথা শুরু করি।

রাবেয়া ?

কী ?

কোথায় কোথায় বেড়াতে যাস তুই ?

কত জায়গায়। চেনা বাড়িতে।

খুব ভালো লাগে ?

হু।

কাকে কাকে ভালো লাগে ?

সবাইকে।

ছেলেদের ভালো লাগে ?

হু।

নাম বল তাদের।

একটানা নাম বলে চলে সে। তাদের কাউকেই সন্দেহভাজন মনে হয় না আমার। সবাই বাচ্চা বাচ্চা ছেলে। রাবেয়াকে বড় আপা ডাকে।

তারা তোকে আদর করে রাবেয়া ?

হু।

কী করে আদর করে ?

আমার সঙ্গে খেলে, আর...

আর কী ?

গল্প করে।

কিসের গল্প ?

ভূতের।

ইতস্ততঃ করে বলি,

তোকে কেউ চুমু খেয়েছে রাবেয়া ?

যাহ! তাই বুঝি খায় ?

মার কথাগুলো হয় আরও স্পষ্ট, আরও খোলামেলা। আমার লজ্জা করে। মা আদুরে গলায় বলেন, রাবেয়া কে তোর শাড়ি খুলেছিল ? বল তো নাম ?

যাও মা, তুমি তো ভারি...

মা রেগে যান। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, তাহলে এমন হলো কেন ? বল তুই হারামজাদি ?

রাবেয়া বলে না কিছু, মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। রাবেয়া বড় বড় চোখে তাকায়। বলে, 'কাঁদো কেন মা ?'

বল, কার সঙ্গে তুই শুয়েছিলি। [পৃষ্ঠা: ৪৫-৪৬]

কথাশিল্পের কথাটা যদি কেউ বলেন, তাহলে এ হলো 'কথাশিল্পী'। অনেক কথা যাও যে বলে, কোনো কথা না বলি– রবীন্দ্রনাথের এ গানের যে মাহাত্ম্য আছে, তা যেন হুমায়ূন আহমেদের হাতেই বাংলা কথাসাহিত্যে ফুটে উঠেছে।

অনুত্তেজনাভাবে একটা খুনের দৃশ্য উপন্যাসে কীভাবে ধারণ করা যায়, তার একটা মশক হুমায়ূন করেছেন এভাবে:

৭. বারোটার দিকে ফিরে এলেন মাস্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মন্টু, দিনে-দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালাফালা করে ফেলল মাস্টার কাকাকে একটা মাছ কাটা বটি দিয়ে। পাশের দোকান থেকে দৌড়ে এল দু-তিন জন। একজন রিকশাওয়ালা রিকশা ফেলে ছুটে এল। ওভারশিয়ার কাকুর বড় ছেলে জসীম দৌড়ে এল। ডাক্তার সাহেব চেঁচাতে লাগলেন, 'হেল্প! হেল্প!' চিৎকার শুনে বাইরে এসে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম, বটি হাতে মন্টু দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে তাকে জাপটে ধরে আছে কজন মিলে। রক্তের একটা মোটা ধারা গড়িয়ে চলছে নালায়। মন্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা ওকে আমি মেরে ফেলেছি।

আমার মনে পড়ল হাসনুহানা গাছের নীচে মন্টু একদিন পিটিয়ে একটা মস্ত বড় সাপ মেরেছিল। [পৃষ্ঠা: ৫৩]

নন্দিত নরকে উপন্যাসের বীর চরিত্র তো মন্টু। অথচ লেখক তাকে আশ্চর্যভাবে অদৃশ্যমান করে রেখেছিলেন সমগ্র উপন্যাসজুড়ে। মন্টু দৃশ্যমান হলো শেষ দৃশ্যে, যখন সে একটা খুন করল এবং তার ফাঁসি হলো। লাশ নিতে অপেক্ষা করার মধ্যে লেখক পাঠকের হৃৎপিণ্ডের একটা পরীক্ষা লিখেন:

৮. গাছের নীচে ঘন অন্ধকার। কী গাছ এটা ? বেশ ঝাঁকড়া। অসংখ্য পাখি বাসা বেঁধেছে। তাদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে ম্লান জ্যোৎস্নার আলো। কিছুক্ষণের ভেতরই চাঁদ ডুবে যাবে। জেলখানার সেন্ট্রি দুজন সিগারেট খাচ্ছে। দুটি আগুনের ফুলকি ওঠানামা করছে দেখতে পাচ্ছি। তাদের ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ছায়ামূর্তি মনে হয়। জেলখানার গেটের মাথার ঠিক উপরে একশো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে একটা, বাতির চারপাশে অনেক পোকা ভিড় করেছে। বাবা বললেন, খোকা কটা বাজে? বলতে বলতে বাবা বুকে হাত রাখলেন। তাঁর বুক পকেটে জেলারের চিঠি রয়েছে। সেটি দেখালেই তারা মন্টুকে আমাদের হাতে তুলে দেবেন। মন্টুকে আমরা

ঘরে ফিরিয়ে নেব। ঘরে, যেখানে মা আজ সারা রাত ধরে কোরান শরীফ পড়ছেন।

বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না হয়েছে। কিছুক্ষণের ভেতর চাঁদ ডুবে যাবে। আমি আর বাবা ঘেঁষাঘেষি করে বসে আছি সিমেন্টের বেঞ্চিতে। মাথার ওপর ঝাঁকড়া অন্ধকার গাছ। বাবা নড়েচড়ে বসলেন। তাঁর দ্রুত শ্বাস নেয়ার শব্দ পাচ্ছি। তিনি একটু আগেই জানতে চাইছিলেন, ক'টা বাজে।

আমরা সবাই মাঝে মাঝে এমনি ঠান্ডা মেঝেতে বসে বাইরের জ্যোৎস্না দেখতাম। হাসনুহানা গাছে কী ফুলই-না ফুটত। আমাদের বাসার সামনে মাঠে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। সেখানে অসংখ্য জোনাকি জ্বলত আর নিভত। [পৃষ্ঠা: ৬৫-৬৬]

এ স্তবকের পরে ছিল আর একটি লাইন: "জোনাকি, ঝিকিমিকি জ্বালো আলো' গান বাজিয়েছিলেন নাহার ভাবি"। কারও মনে হতে পারে এমন কঠিন-কঠোর দুঃখেও হুমায়ূন কেন এমন একটা গানের কথা, নাহার ভাবির প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। ধারণা করা যায়, লেখক পাঠকের 'নার্ভ'-কে আর পরীক্ষা করতে চাননি, হয়ত অনেক পাঠক তা সহ্য করতে পারতেন না, যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত। এখানেও হুমায়ূন আহমেদের অসাধারণত্ব চোখে পড়ে।

লোকজ শব্দের মহাসমারোহ

সমগ্র উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ যে অসংখ্য ধনাত্মক লোকজ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা *নন্দিত নরকে* গ্রন্থের পাঠক প্রিয়তাকে আরও অগ্রগামী করে দিয়েছিল:

১. সে তার জ্যামিতি খাতায় আঁকিবুকি করতে লাগল। [পৃষ্ঠা: ১৯]।

২. আমি টেবিলে রাখা জগে মুখ লাগিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াই। [পৃষ্ঠা: ২১]।

৩. তিনি হড়হড় করে বমি করে ফেললেন। [পৃষ্ঠা: ২২]।

৪. গলার কাছটায় ভার ভার লাগত। [পৃষ্ঠা: ২৩]।

৫. ঝকঝক করছে তারা। [পৃষ্ঠা: ৩১]।

৬. খড়মের খটখট শব্দটা থেমে যেত। [পৃষ্ঠা: ৩২]।

৭. কেবলি গুনগুন করছে কানের কাছে [পৃষ্ঠা: ৩৫]।

৮. বয়স অগ্রাহ্য করে পরা চকচকে শাড়িতে তাকে হাস্যকর লাগছিল...। [পৃষ্ঠা: ৪১]।

৯. কী ভ্যাজর ভ্যাজর করছিস। [পৃষ্ঠা: ৪৪]।

১০. একটা মাছি রাবেয়ার নাকের কাছে ভনভন করছে। [পৃষ্ঠা: ৫২]।

১১. মাথার উপর ছটি নড়বড়ে রঙ ওম ক্যান ক্যাঁ ক্যাঁ করে ঘুরছে। [পৃষ্ঠা: ৬০]।

এ লোকজ শব্দগুলো *নন্দিত নরকে* উপন্যাসের ভাবসম্পদ। উপন্যাসে নানা বর্ণনা ও কথাকে লোকজ শব্দগুলো প্রাণদান করেছে।

প্রবাদ বা প্রবাদ সমতুল বাক্য

লোকজ প্রবাদ বাক্য বা প্রবাদ সমতুল যেসব বাক্য উপন্যাসে লেখক ব্যবহার করেছেন, তাও সমগ্র কাহিনিকে গতি এনে দিয়েছে:

১. খুব যখন তারা ওঠে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। [পৃষ্ঠা: ৩১]।

২. সব ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। বৃত্ত দিয়ে ঘেরা। [পৃষ্ঠা: ৩২]।

৩. মীন রাশির লোক দার্শনিক আর ভাগ্যবান হয়। [পৃষ্ঠা: ৩৩]।

৪. মেয়েদের মানসিক প্রস্তুতি শুরু হয় ছেলেদেরও আগে। [পৃষ্ঠা: ৩৫]।

৫. খালি পায়ে বেড়াবে শিশিরের উপর। চোখ ভালো থাকে। [পৃষ্ঠা: ৩৭]।

৬. স্মৃতি সুখেরই হোক বেদনারই হোক, সমসময় করুণ। [পৃষ্ঠা: ৬২]।

মধ্যবিত্তের জীবনকাহিনি

নন্দিত নরকে আরও যে কারণে বাংলাভাষী পাঠকসমাজে আদৃত ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল, তা হলো এটা একান্তভাবেই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের একটি কাহিনি, যা তাদের দুঃখ-বেদনা, আনন্দ, হাসি-কান্না, অসহায়ত্বকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। মধ্যবিত্ত জীবনের উত্থান ও পতন, উল্লাস-হাহাকার, দোলাচল, দোদুল্যমানতা এ কাহিনির উপজীব্য:

মধ্যবিত্তের মা:

১. ভোরে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই মায়ের কান্না শুনলাম। মা অসুখ-বিসুখ একবারেই সহ্য করতে পারেন না। অল্প জ্বর, মাথা ব্যথা, এতেই কাহিল। [পৃষ্ঠা: ২০]।

২. আমরা কেউ যখন কোন একটা জিনিসের জন্য আব্দার করি এবং মা যখন সেটি দিতে পারেন না তখন তাঁর মুখ এমনি লম্বাটে হয়ে বাচ্চা খুকীদের মতো দেখাতে থাকে। তাঁর নাকের পাতলা চামড়া তির তির করে কাঁপতে থাকে। [পৃষ্ঠা: ২১-২২]।

মধ্যবিত্ত তরুণ মা-বাবা, ভাইবোনকে ভালোবাসে, প্রাণপণে তাদের জন্য কিছু করতে চায়। কিন্তু সে অসহায়। সে দিবা-রাত্র সুখের জন্যই ক্রন্দন করে। কিন্তু বাস্তবতার কাছে তাকে হেরে যেতে হয়।

৩. কদিন ধরেই দেখছি মা কেমন যেন বিমর্ষ। বড় ধরনের কোনো রোগ সারবার পর যেমন সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছায়া পড়ে তেমনি। বয়স হয়েছে, ভাঙা চাকার সংসার টেনে নিতে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, দেহ-মন শান্ত তো হবেই। তবু তাঁর এমন অসহায় ভাবটা আমার ভালো লাগে না। খুব শিগগিরই হয়তো আমি একটি ভালো চাকরি পাব। আমি সবাইকে পরিপূর্ণ সুখী করতে চাই। মাকে নিয়ে একবার সীতাকুণ্ড বেড়াতে যাব। কলেজে যখন পড়ি তখন ক'জন বন্ধুকে নিয়ে একবার গিয়েছিলাম। এত সুন্দর, এত আশ্চর্য। চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে দূরের সমুদ্র দেখা যায়। মা নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠতে পারবেন না। মা আর বাবাকে নিচে রেখে আমরা সবাই উপরে উঠব। বাবাও হয়তো উঠতে চাইবেন। ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে উঠতে পারলে দেখা যাবে। রেকর্ড প্লেয়ার নেব, অনেক রেকর্ডও নিয়ে যাব। [পৃষ্ঠা: ৩৭-৩৮]

নন্দিত নরকে উপন্যাসে একজন মধ্যবিত্ত তরুণের অসহায় চিত্র

অঙ্কিত হয়েছে, যে আসলে সকল বাঙালি তরুণেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তার সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই। তার বড়ো বড়ো স্বপ্নগুলো, বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটো হতে থাকে:

> ৪. আমি সমস্ত কিছু বুঝতে চাই। আমি সবাইকে ভালোবাসি। যে সংসার বাবা গড়ে তুলেছেন সেখানে আমার যা ভূমিকা আমি তারচে অনেক বেশি করতে চাই। যদি কোনো জটিলতা এসেই থাকে তবে সে জটিলতা থেকে আমি দূরে থাকতে চাই না। আমি চাই সবাই সুখী হোক। রুনু শীলুর মতো একটি ময়না এনে পুষুক যেটি সময়ে অসময়ে মানুষের মতো সুখের শিস দিয়ে উঠবে। [পৃষ্ঠা: ৪৩-৪৪]
>
> ৫. আমাদের পয়সা নেই। আমার ছোট হয়ে যাওয়া সার্ট মন্টু পরে। আমরা কাপড় কিনি বছরে একবার, রোজার ঈদে। [পৃষ্ঠা: ২৩]
>
> ৬. আমার হাতে টাকা ছিল না। তবু আমি মনস্থির করে ফেললাম। রুনুকে একটা খুব ভালো খাতা কিনে দেব। [পৃষ্ঠা: ২৪]
>
> ৭. তোষকের নিচে আমার ডাক্তারখানা। অ্যাসপিরিন, ডেসপ্রোটেব এই জাতীয় টেবলেট জমানো আছে। অন্ধকারেই আমি মাঝারি সাইজের টেবলেট খুঁজতে লাগলাম। এ ঘরে আলো নেই। কোথাও যেন তার জ্বলে গেছে। [পৃষ্ঠা: ২০]
>
> ৮. আমাদের চিকিৎসার টাকা ছিল না। নিখরচার চিকিৎসা তাই আমরা প্রাণপণে করতাম। [পৃষ্ঠা: ২৮]
>
> ৯. বাবার পয়সা ছিল না বলেই হয়তো অহংকার ছিল। শীলুদের পরিবারকে তাঁর একটুও পছন্দ হতো না। নিজে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন, অন্যের সুখ সে কারণে সহজভাবে নেওয়ার মানসিকতা তাঁর ছিল না। [পৃষ্ঠা: ২৯]
>
> ১০. রুনুর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম সবাই। রুনু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদা তোমার চাকরি হলে আমায় নিয়ে বেড়াতে যাবে ?
>
> নিশ্চয়।
>
> আমি কিন্তু কক্সবাজার যাব। শীলুরা গিয়েছিল গতবার।
>
> বেশ তো।
>
> আর যেদিন প্রথম বেতন পাবে সেদিন...
>
> সেদিন কি রুনু ?
>
> সেদিন আমাকে দশ টাকা দিতে হবে। দেবে তো?
>
> হ্যাঁ, কি করবি ?
>
> এখন বলব না। [পৃষ্ঠা: ৩৯]

কথাগুলোতে রোমান্টিকতা জড়িয়ে থাকলেও এটা মধ্যবিত্ত জীবনেরই কাহিনি। এ কাহিনি বাংলার সমাজে চিরায়ত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *পথের পাঁচালী*'তে মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণাকে তুলে ধরেছিলেন, হুমায়ূন আহমেদের হাত ধরেও এ জীবন একইরূপে বিরাজমান থেকেছে। কারণ মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণার লেলিহান শিখা এখনও পোড়াচ্ছে।

মধ্যবিত্ত তরুণ এখনও ভালোবাসতে পারে না, কারণ ভালোবাসা সে গোপনে মনের ভেতর পুড়তে থাকে, 'ভালোবাসা সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আমি বুকের ভেতর গোপন ভালোবাসা পুষেছি'। [পৃষ্ঠা: ৪১]। মধ্যবিত্ত তরুণের ভালোবাসা পরাবাস্তব:

> শীলু তোমাকে আমি গোপনে করুণা বলে ডাকি। তোমার জন্যে আমার অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হয়। প্রতি রাতে তোমাকে নিয়ে কত কি ভাবি। যেন তোমার কঠিন অসুখ করেছে। শুয়ে শুয়ে দিন গুনছ মৃত্যুর। হঠাৎ একদিন আমি গিয়ে দাঁড়ালাম তোমার বিছানার পাশে। তুমি ছেলেমানুষের মতো বললে, এতদিন পরে এলেন ? [পৃষ্ঠা: ৪১]

মধ্যবিত্ত তরুণের এ কষ্ট কল্পনার সংশয়ী ভালোবাসা তাই আর কখনোই বাস্তবরূপ নিতে পারে না। মধ্যবিত্ত তরুণ পরমভাবে রোমান্টিক, কিন্তু ভীরু মনের লাজুকতায় তা সুতার নাগাল পায় না, ঘুড়ি উড়ে যায়। মধ্যবিত্ত জীবনের এ সংগ্রামমুখর কাহিনিকে হুমায়ূন আহমেদ যেভাবে ধরতে পেরেছিলেন, তাঁর সমকালের অন্য কেউ তা নন। *নন্দিত নরকে* নামক পতাকা হাতে হুমায়ূন আহমেদ এসব নানা কারণেই তাঁর কালকে ছাড়িয়ে অন্যরকম এক উচ্চতায় সমাসীন, যেখানটা স্পর্শ করার সামর্থ্য বাংলা কথাসাহিত্যে আর ঘটবে বলে মনে করি না। কারণ *নন্দিত নরকে* বাঙালি পাঠক মধ্যবিত্তের এ দোলাচলে নিজেকে খুঁজে পায়, আর সেজন্য *নন্দিত নরকে* বার বার সে পড়ে, উলটে দেখে, ঘ্রাণ নেয়। এটা চলতেই থাকে, চলতে থাকবেই।

ড. মোহাম্মদ হাননান: লেখক ও গবেষক

বীর মুক্তিযোদ্ধারা পেলেন স্মার্টকার্ড ও ডিজিটাল সনদ

দেশের বিভিন্ন স্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে ডিজিটাল সনদ ও স্মার্টকার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ২৪শে অক্টোবর পাবনার ঈশ্বরদী ও বেড়া এবং নওগাঁর মান্দায় এসব বিতরণ করা হয়। ঈশ্বরদীতে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে ৮৫৬টি ডিজিটাল সনদ ও স্মার্টকার্ড মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের স্বজনদের প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ নুরুজ্জামান বিশ্বাস।

বেড়া উপজেলা অডিটোরিয়ামে প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনাসভা ও ১৮৪ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মাঝে ডিজিটাল স্মার্টকার্ড ও সনদপত্র এবং ১৩৩ জন মৃত মুক্তিযোদ্ধার উত্তরসূরিদের হাতে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে।

মান্দায় উপজেলা পরিষদের হলরুমে আলোচনাসভা ও ১৫২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মাঝে স্মার্টকার্ড ও ডিজিটাল সনদ বিতরণ করা হয়। ইউএনও আবু বক্কার সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন উপজেলা চেয়ারম্যান এমদাদুল হক মোল্লা, ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবা সিদ্দিকা রুমা, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জাকির মুন্সী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফছার আলী মণ্ডল, খোদাবক্স মিয়া ও আব্দুল মান্নান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শাকিল আহমেদ, জনস্বাস্থ্যের উপসহকারী প্রকৌশল এনায়েত হোসেন প্রমুখ।

প্রতিবেদন: দেব কুমার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের বোরিং কার্যক্রম উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন– পিআইডি

সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল

মো. আবু নাছের

সাড়ে তিন বছর পর আবুধাবি থেকে দেশে ফিরেছেন সাজ্জাদ। দুবাই শহরে মামার হোটেল ব্যবসায় সহযোগিতা করেন তিনি। সর্বশেষ করোনা শুরুর আগে এসেছিলেন। বাড়ি আনোয়ারার চাতুরি এলাকায়। দীর্ঘদিন পর দেশে ফেরার উচ্ছ্বাস তার চোখেমুখে। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ছোটো ভাই আসছেন এয়ারপোর্টে তাকে রিসিভ করতে। মাইক্রোবাস ভাড়া করে তারা চাতুরি চৌমুহনী থেকে রওয়ানা দিয়েছেন, কিন্তু শহর পেরুতেই দেড় ঘণ্টা। আনোয়ারা থেকে তিন ঘণ্টায় এয়ারপোর্ট পৌঁছাতে পারেননি প্রিয়জনরা। অপ্রত্যাশিত এ অপেক্ষা এতদিন পর ঘরে ফেরা সাজ্জাদের উচ্ছ্বাসকে যেন খানিকটা বিবর্ণ করে দেয়।

একই ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন বাঁশখালীর তোফাজ্জল। সৌদি আরবের মদিনায় তাঁর নিজের ব্যাবসা। দুই তিন মাস পর পর দেশে আসেন। মায়ের অসুস্থতার খবর জানতে পেরে অনেক চেষ্টায় একটা টিকেট ম্যানেজ করে দেশে এসেছেন। কিন্তু শহরের যানজট তো অনিশ্চিত। কখন বাড়ি ফিরে মা'কে দেখবেন, সে অনিশ্চয়তার দোলাচলে তোফাজ্জল সাহেব। শেষমেষ এয়ারপোর্ট থেকেই গাড়ি ভাড়া করে রওয়ানা করলেন বাড়ির উদ্দেশ্য।

আনোয়ারা, বাঁশখালী, কর্ণফুলী, পটিয়া খুব দূরের পথ নয়। এয়ারপোর্ট হতে সরাসরি যাওয়ার পথ নেই। যেতে হয় শহর ঘুরে আমানত শাহ সেতু হয়ে। বহতা কর্ণফুলী তৈরি করেছে এ আপাত বিচ্ছিন্নতা। নদীর ওপারেই যুবক সাজ্জাদ আর মাঝবয়সি তোফাজ্জলের আবাস। অথচ সরাসরি পথ নেই যাওয়ার। চট্টগ্রাম শহর হয়ে বাড়ি পৌঁছতে তিন থেকে চার ঘণ্টা। আর স্পিডবোটে নদী পার হলে বড়ো জোর বাড়ি পৌঁছতে আধাঘণ্টা। কিন্তু সে ব্যবস্থাও তো নেই। অগত্যা এত দূর আকাশ পথ পাড়ি দিয়ে অপেক্ষার প্রহরগুণে বিমানবন্দরে।

তোফাজ্জল সাহেবের গাড়ি ছুটে শহরের দিকে। চারদিকে চলছে উন্নয়ন কাজ। শেষবার সৌদি যাওয়ার আগে টানেলের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন পতেঙ্গা প্রান্তে। ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। দেখে এসেছিলেন কর্ণফুলী নদীর নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গপথের কাজ এগিয়ে চলেছে। খবরের কাজে দেখেছিলেন, এ বছরের ডিসেম্বর নাগাদ কাজ শেষ হবে। মনকে সান্ত্বনা দেন, হবে হয়ত! কিন্তু ততদিন মা কি বেঁচে থাকবেন! স্রষ্টা হায়াত রাখলে আগামী জানুয়ারিতে পরিবার নিয়ে এ টানেল দিয়েই বাড়ি ফেরার স্বপ্ন দেখেন তিনি।

সাজ্জাদ, তোফাজ্জলদের মতো অসংখ্য মানুষের অপেক্ষার পালা শেষ হতে যাচ্ছে। এ বছরের ডিসেম্বরেই শেষ হতে যাচ্ছে বন্দরনগরী এবং আশপাশের মানুষের বহুল প্রত্যাশিত স্বপ্নের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেলের নির্মাণকাজ। এরই মাঝে শতকরা নব্বই ভাগের বেশি কাজ শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর নিচে এটি প্রথম টানেল। এ টানেল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ। ২০১৬ সালের ১৪ই অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও চীনের প্রেসিডেন্ট জি-টু-জি ভিত্তিতে টানেলের নির্মাণকাজ শুরুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য নয় কিলোমিটারের বেশি। মূল টানেলের দৈর্ঘ্য তিন কিলোমিটারের বেশি। এতে রয়েছে দুটি টিউব, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই কিলোমিটার। টিউবের ভেতরের ব্যাস প্রায় এগারো মিটার। চার লেনের টানেল সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে যাচ্ছে।

প্রকল্পটির মোট ব্যয় দশ হাজার তিনশো চুয়াত্তর কোটি টাকা, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা এবং চীন সরকারের অর্থ সহায়তা প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকা। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী টানেল বোরিং মেশিনের সাহায্যে টানেলের প্রথম টিউবের খনন কাজ উদ্‌বোধন করেন। পরের বছরের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে প্রথম টিউবের খনন কাজ শেষ হয়। বর্তমানে এ টিউবের ভেতরের কাঠামোর কাজ চলছে। এরই মাঝে পেভমেন্ট স্ল্যাব এর কাজ শতকরা ৯৩ ভাগের বেশি এবং অগ্নিনিরোধক বোর্ড স্থাপনের কাজ শতকরা সাতষট্টি ভাগ শেষ হয়েছে।

টানেলের দ্বিতীয় টিউবটির খনন কাজ ১২ই ডিসেম্বর ২০২০ এ আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী। পরের বছর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে খনন কাজ শেষ হয়। বর্তমানে এ টিউবের ভেতরের কাঠামোর কাজ চলছে। এরই মাঝে পেভমেন্ট স্ল্যাব-এর কাজ শতকরা সাতানব্বই ভাগের বেশি এবং অগ্নিনিরোধক বোর্ড স্থাপনের কাজ ছিয়ানব্বই ভাগ শেষ হয়েছে। এছাড়া ডেকোরেটিভ বোর্ড স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে আনোয়ারা প্রান্তে সাতশো সাতাশ মিটার ওভার ব্রিজ নির্মাণকাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। উভয় প্রান্তে প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ সড়কের কাজ প্রায় শেষ প্রান্তে।

পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় টানেল নির্মাণে উভয় প্রান্তে দুই হাজার তিনশো পনেরো জন ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকের মাঝে অতিরিক্ত মঞ্জুরিসহ তিনশো বারো কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পে দুইশো সাতাশ জন চীনা নাগরিক এবং প্রায় এগারোশো বাংলাদেশি নাগরিক কাজ করছেন।

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের প্রধান বন্দরনগরী এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রাম শহরকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। নদীর একপাশে রয়েছে শহর ও বন্দর এবং অপর পাশে ভারী শিল্প এলাকা। শহরের দুটি অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ণফুলী সেতু বা শাহ আমানত সেতু দ্বারা সংযুক্ত, যা চট্টগ্রাম বন্দর হতে যথাক্রমে সাড়ে নয় কিলোমিটার ও একুশ কিলোমিটার উজানে অবস্থিত। কর্ণফুলী নদীর গঠন ব্যবস্থা, প্রবাহ ও তলদেশের পলি এবং জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থার বিষয় বিবেচনায় রেখে সরকার বন্দরের কাছাকাছি কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। বীর চট্টলার উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকার সবসময় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। চট্টগ্রামের সাথে পার্বত্য জেলাসমূহ এবং পর্যটন নগরী কক্সবাজারকে ঘিরে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে সরকার। এ পরিকল্পনার আওতায় মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, কর্ণফুলীর ওপাড়ে কোরিয় ইন্ডিজেড, কক্সবাজারের মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ অন্যান্য প্রকল্প দেশের অর্থনীতিতে আগামী দিনে সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মুক্ত করতে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়ন এবং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এসব উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামোর রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক। সে লক্ষ্যে নির্মাণাধীন কর্ণফুলী টানেল ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজারের সংযোগকে আরো গতিময় এবং সাশ্রয়ী করে তুলবে।

পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে আরও কিছু উদ্যোগ নিয়েছে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়। টানেলের আনোয়ারা প্রান্ত থেকে ওয়াই জংশন পর্যন্ত মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ছয় লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়ে এসেছে। এছাড়া চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ছয় লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিরসরাই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিনড্রাইভ নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। পটিয়া শহরের যানজট নিরসনে বাইপাস নির্মাণ করা হয়েছে। কক্সবাজার লিংকরোড থেকে লাবণী পয়েন্ট পর্যন্ত মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ শেষ হয়েছে। এর আগে অক্সিজেন থেকে হাটহাজারী সড়ক ডিভাইডারসহ প্রশস্ত করা হয়েছে। চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কের হাটহাজারী থেকে মানিকছড়ি পর্যন্ত সড়ক প্রশস্ত করার কাজ শেষ হতে চলেছে। চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়কের হাটহাজারী-রাউজান অংশ চার লেনে উন্নীতকরণ কাজও শেষ প্রান্তে। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে পটিয়া সেতু, চন্দনাইশে মাজার পয়েন্ট সেতু, দোহাজারি এলাকায় সাঙ্গু সেতু এবং চকরিয়ায় মাতামুহুরী সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হতে চলেছে। শেষ হয়েছে ফটিকছড়ি-হেঁয়াকো সড়ক উন্নয়ন কাজ।

সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রম বদলে দিবে বৃহত্তর চট্টগ্রামের দৃশ্যপট। আনোয়ারা, বাঁশখালী, পটিয়া এলাকায় বিশেষ করে নদীর ওপাড়ে সম্প্রসারিত হবে মহানগরী। গড়ে উঠবে শিল্পকলকারখানা এবং আবাসন ব্যবস্থা। একদিকে ব্যাবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অপরদিকে পর্যটনশিল্পের বিকাশে বঙ্গবন্ধু টানেল রাখবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম কক্সবাজার হয়ে টেকনাফ পর্যন্ত গড়ে উঠবে নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

আধা ঘণ্টার দূরত্বের জন্য আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে না। অচিরেই অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলেছে সাজ্জাদ হোসেন এবং তোফাজ্জল আলীর মতো অসংখ্য মানুষের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণের ফলে চট্টগ্রাম শহর চীনের সাংহাই নগরীর মতো 'ওয়ান সিটি অ্যান্ড টু টাউন' মডেলে গড়ে উঠবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ার পাশাপাশি এশিয়ান হাইওয়ের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। চট্টগ্রাম বন্দর ও প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দরের সুষ্ঠু কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে। কর্ণফুলী নদীর পূর্ব প্রান্তের প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত চট্টগ্রাম শহর, বন্দর ও বিমানবন্দরের সাথে উন্নত ও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হবে। ফলে পূর্ব প্রান্তের শিল্পকারখানার কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত মালামাল চট্টগ্রাম বন্দর, বিমানবন্দর ও দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিবহণ সহজ হবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধিসহ উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা তৈরি করবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল। বদলে যাবে *বীর প্রসবিনী* চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য এলাকাসহ পর্যটন নগরী কক্সবাজার। উন্মুক্ত হবে সম্ভাবনার নতুন স্বর্ণদুয়ার।

মো. আবু নাছের: উপসচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, nasertipu007@gmail.com

৩রা নভেম্বর জেল হত্যা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তির বিচ্যুতি

ড. মো. আব্দুস সামাদ

> সৃষ্টিকর্তা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যদি না থাকতো আমাদের যা কিছু অর্জন বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, উদ্ভাবন, সবই ভূলুণ্ঠিত হতো। রাষ্ট্র কাঠামো আছে বলেই সবগুলো রক্ষিত হচ্ছে। যেটা আজকের বাংলাদেশ, এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন রকমের রাজা ছিল, সামন্তবাদী জমিদার ছিল, ভুঁইয়ারা ছিল, এমন বহু কিছু ছিল, কিন্তু এই অঞ্চল কখনো একটা আধুনিক রাষ্ট্র হবে সেটা কখনো কেউ চিন্তা করেনি। [সূত্র: শরীফ উদ্‌দীন আহমেদ সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*]

এই স্বাধীন সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি করে দিয়েছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার পর দ্বিতীয় কলঙ্কজনক অধ্যায় ৩রা নভেম্বর দিনটি। ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর চার জাতীয় নেতা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানীকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে।

বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সবচেয়ে ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক সদস্য হিসেবে পরিচিত তৎকালীন স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং বঙ্গবন্ধুর দুই খুনি বহিষ্কৃত কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান এবং লে. কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যার এ পরিকল্পনা করেন। এ কাজের জন্য তারা একটি ঘাতক দলও গঠন করেন। এ দলের প্রধান ছিল রিসালদার মোসলেমউদ্দিন। সে ছিল ফারুকের সবচেয়ে আস্থাভাজন।

১৫ই আগস্ট শেখ মণির বাসভবনে যে ঘাতক দলটি হত্যাযজ্ঞ চালায় সেই দলটির নেতৃত্ব দিয়েছিল মোসলেমউদ্দিন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার পরপরই জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনাটি এমনভাবে নেওয়া হয়েছিল যাতে পালটা অভ্যুত্থান ঘটার সাথে সাথে আপনাআপনি এটি কার্যকর হয়।

এ কাজের জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ঘাতক দলও গঠন করা হয়। এই ঘাতক দলের প্রতি নির্দেশ ছিল পালটা অভ্যুত্থান ঘটার সাথে সাথে কোনো নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়ে তারা জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করবে। ১৯৭৫-এর ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ পালটা অভ্যুত্থান ঘটানোর পরেই কেন্দ্রীয় কারাগারে এই জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে জাতির পিতাকে তাঁর ঐতিহাসিক ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে। পরে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় কোটি কোটি বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর অপর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এএইচএম কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি ও কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতা হত্যার তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল লন্ডনে। এসব হত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন ও বিচারের প্রক্রিয়াকে যে সমস্ত কারণ বাধাগ্রস্ত করেছে সেগুলোর তদন্ত করার জন্য ১৯৮০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। তবে সেই সময়ে বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগিতার কারণে এবং কমিশনের একজন সদস্যকে ভিসা প্রদান না করায় এ উদ্যোগটি সফল হতে পারেনি। তখন বাংলাদেশের সরকারপ্রধান ছিলেন জিয়াউর রহমান।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদের *ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড* গ্রন্থে এই কমিশন গঠনের বর্ণনা রয়েছে। এতে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা, মনসুর আলীর পুত্র মোহাম্মদ সেলিম

এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের আবেদনক্রমে স্যার থমাস উইলিয়ামস, কিউ. সি. এমপি'র নেতৃত্বে এই কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশ ও বিদেশে অনুষ্ঠিত জনসভাসমূহে এ আবেদনটি ব্যাপকভাবে সমর্থিত হয়।

১৯৯১-তে এসে ফ্রিডম পার্টির নেতা কর্নেল রশীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন তাদের এক সংবাদ সম্মেলনে। জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে সেই সংবাদ সম্মেলন তিনি কেন করেছিলেন, সে আলোচনায় না গেলেও তার আনা অভিযোগগুলো আলোচনার দাবি রাখে। তবে তার এসব দাবির সত্যাসত্য বিচার করার জন্য যাদের দরকার ছিল, তারা কেউ তখন বেঁচে ছিলেন না। অভিযোগগুলো ছিল– 'জিয়া সাহেব মুজিবকে হত্যা করার কথা আগে থেকেই জানতেন, মুজিবকে মারার পর জিয়া সাহেব নিজেই রাষ্ট্রপ্রধান হতে চেয়েছিলেন, জিয়া সাহেব চার নেতা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন, জিয়া সাহেবই ৩রা নভেম্বরের ক্যু ঘটিয়েছেন। তার সাথে ছিলেন খালেদ মোশাররফ।'

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এবং ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ড কেবলমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা বদল করার একটা অভ্যুত্থান ছিল না। তখন বিভিন্ন দেশে প্রায়ই অভ্যুত্থান হতো, এই অভ্যুত্থানের কারণ ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা বদল করা। সকালে একজন, বিকালবেলা আরেকজন। তখন কমন একটা ব্যাপার ছিল ক্ষমতা দখল। পুরা বিশ্ব কোল্ড ওয়ারের আওতায় ছিল। রাশিয়ান বলয়, আমেরিকান বলয়। পালটাপালটি এগুলো ছিল। ১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থান, এটা এরকম ক্ষমতা দখল করার একটা অভ্যুত্থান ছিল না। একদল সেনাবাহিনীর থেকে আরেক দল সেনাবাহিনীর জেনারেল ক্ষমতা নেওয়ার অভ্যুত্থান নয়। পুরো রাষ্ট্রটাকে বদল করার অভ্যুত্থান ছিল সেটা।

১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৭০-এর নির্বাচন সব কিছুকে নিয়ে ১৯৭১ সালে যখন মহান মুক্তিযুদ্ধ, ৩০ লক্ষ লোকের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীন রাষ্ট্রটা তৈরি করা হয়, এটাকে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করা হয়। অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের যত অনুষঙ্গ ছিল, সব ফিরে এল। একজনের পর একজন জেনারেল এল, আমাদের পুরো গণতন্ত্রকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে বন্দি করা হলো। আমরা ক্যান্টনমেন্টে অবরুদ্ধ ছিলাম ২০-২২ বছর। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে এই দেশটা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, ১৯৭৫'র পর সে রাষ্ট্রটি ছিল না। এটা কেবল পুনরুদ্ধার করা হয় ১৯৯৬ সালে, পাকিস্তান থেকে আবার বাংলাদেশ। যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, সেটার পুনঃজন্ম হয়।

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম. মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানের মানবতা লঙ্ঘনকারী নির্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঐ নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলো এমন এক সময়ের ইতিহাস যাকে দলমতের উর্ধ্বে উঠে বস্তুনিষ্ঠভাবে গবেষণা এবং বিশ্লেষণ না করা ও তার থেকে শিক্ষা না নেওয়ার বিষয়টিও ছিল অন্যতম কারণ।

স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মধ্যে যে দেশে জাতির পিতাকে সপরিবার হত্যা করা হয়, যে দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া জাতীয় চার নেতাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, সেই দেশ তখন-ই পঙ্গু হয়ে যায়। এরপর কেবল চলে আদর্শ বিচ্যুতি আর লুটেরা রাজনীতি। আলো ছড়িয়ে দেওয়ার মানুষগুলোই যখন থাকে না, তখন সে দেশ অন্ধকারে ডুবে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

নিঃসন্দেহে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। বাঙালি জাতি তার দীর্ঘদিনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নিজেদের জন্য একটি জাতি রাষ্ট্র গঠন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি কী হবে? ১৯৭০ ও ১৯৮০'র দশকে জেনারেলরা ট্যাঙ্কের বলে সংবিধান ইচ্ছামতো স্থগিত করেছে, সংশোধন করেছে। বাংলাদেশকে বানিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। বাংলাদেশকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাছে, যারা বাংলাদেশের জন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দুটোই অস্বীকার করে। দেশের ও আশপাশের মৌলবাদী আগ্রাসন রোধে এবং নিকৃষ্টতম লুণ্ঠন ও দুর্নীতি, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের রাষ্ট্র গড়তে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার কাছে ফিরতে হবে; বাংলাদেশকে তার দার্শনিক ভিত্তি– বাঙালিত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজকে রাষ্ট্রীয় নীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্বকোষ*;
২. কর্নেল শাফায়াত জামিল (অব.), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর;*
৩. নির্মলেন্দু গুণের, *রক্তাক্ত নভেম্বর ১৯৭৫;*
৪. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন পিএসসি (অব.), *বাংলাদেশ: রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১;*
৫. লে. কর্নেল (অব.) এম.এ. হামিদ পিএসসি, *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও না বলা কিছু কথা;*
৬. শারমিন আহমদ, *৩ নভেম্বর–জেল হত্যার পূর্বাপর;*
৭. মেজর (অব.) নাসির উদ্দিন, *গণতন্ত্রের বিপন্নধারায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী;*
৮. অ্যান্থনী মাসকারেনহাস, *বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড;*
৯. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস: বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড*;
১০. কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম বীর বিক্রম, *দাম দিয়ে কিনেছি এই বাংলা;*
১১. শরীফ উদ্‌দীন আহমেদ সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ।*

ড. মো. আব্দুস সামাদ : সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ma.samad@history.jnu.ac.bd

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশের নারীর সম্ভাবনা

ড. শিল্পী ভদ্র

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্রেট রিসেট প্রস্তাবনায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে COVID-19 মহামারি-পরবর্তী অর্থনীতি পুনর্গঠনের কৌশলগত টেকসই সমাধান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ধারণাটি প্রথম এপ্রিল, ২০১৩ সালে জার্মানিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর ফলে স্বয়ংক্রিয়করণ, উন্নত যোগাযোগ, স্ব-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যার বিশ্লেষণ এবং নিরসন হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দেবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি বলেন, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার, বিদ্যুতের ব্যবহার এবং ট্রানজিস্টার আবিষ্কার ব্যাপক শিল্পায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে মানবসভ্যতার গতিপথ বদলে দিয়েছিল বলে ঐ তিন ঘটনাকে তিনটি শিল্পবিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এখন বলা হচ্ছে, ডিজিটাল প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের পথ ধরে আসছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, যেখানে বহু প্রযুক্তির এক ফিউশনে ভৌতজগৎ, ডিজিটালজগৎ আর জীবজগৎ পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে যাচ্ছে। আর তাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লক চেইন, আইওটি, ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছি আমরা। একইসাথে উদ্ভাবনের পথে একযোগে কাজ করতে হবে, তাহলেই আমরা এগিয়ে যাব।

এ প্রসঙ্গে ঢাকাস্থ বিয়াম মিলনায়তনে কোডার্স ট্রাস্ট বাংলাদেশ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, তারুণ্যের শক্তিই দেশকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিচ্ছে। তরুণদের আরও বেশি আইটি বিষয়ক দক্ষতা অর্জন করতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে নারীদের আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে।

দুই বছর ধরে দেশের বিভিন্ন অংশের তরুণ কর্মহীন ও সুবিধাবঞ্চিত এক হাজার নারীকে আইটিতে প্রশিক্ষিত করে তুলেছে কোডার্স ট্রাস্ট বাংলাদেশ। সফলভাবে কোর্স সম্পন্ন করে এখন বিশ্ববাজার থেকে কাজ নিয়ে আয় করছেন এইসব নারীরা। তাদের সেই সাফল্য উদ্‌যাপন, সনদপত্র প্রদান ও সেরা কৃতিত্বের অধিকারীদের পুরস্কৃত করার লক্ষ্যেই কোডার্স ট্রাস্ট বাংলাদেশ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

দীপু মনি বলেন, কোডার্স ট্রাস্ট আজ যা করছে তাতে আমাদের আরও অনেক অনেক উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। তারা আর কারও কাছে চাকরি খুঁজবে না, বরং তারাই এক সময় আরও অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারবে। আর সেখানেই কোডার্স ট্রাস্টের সাফল্য।

কোডার্স ট্রাস্টের উদ্যোগের প্রশংসা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নারীদের প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এমন উদ্যোগ সত্যিকার অর্থেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারীর ওপর বিনিয়োগ করলে তার সুফল পরিবারের সবার কাছে যায়। আর সে কারণেই কোডার্স ট্রাস্টের এ বিনিয়োগ স্মার্ট বিনিয়োগ।

দেশের তরুণ প্রজন্মকে ডিজিটাল শিক্ষায় দক্ষ করে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে বেশকিছু প্রকল্প হাতে নেয় শেখ হাসিনা সরকারের আইসিটি বিভাগ, যার মধ্যে রয়েছে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। দেশের তরুণ প্রজন্মের আত্মকর্মসংস্থান অবারিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ শিগগিরই দেশব্যাপী চালু করবে এ কার্যক্রম। 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং' নামক এ প্রকল্পের আওতায় ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন দেশের তরুণ প্রজন্ম। নারীরা যাতে পিছিয়ে না থাকে প্রযুক্তির এ বিপ্লবে, সেজন্য বিশেষ প্রকল্প নিয়েছে সরকার। 'শি পাওয়ার' বা 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' নামে এ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন নারীরা। উপজেলা পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের টার্গেট করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলাফলকে অনুকূলে নিয়ে আসতে এবং এর নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই এ বিপ্লবকে নিজেদের করে নিতে সবরকম প্রস্তুতি শুরু করেছে। ১৯৬৯ সালে আবিষ্কৃত হয় ইন্টারনেট। শুরু হয় ইন্টারনেটভিত্তিক তৃতীয় শিল্পবিপ্লব। ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সময় তথ্যপ্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হলে সারা বিশ্বের গতি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ম্যানুয়াল জগৎ ছেড়ে যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব আসছে এ ভার্চুয়াল জগতেরই আরও বিস্তৃত পরিসর নিয়ে, যেখানে মানুষের আয়ত্তে আসছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংস বা যন্ত্রের ইন্টারনেট, যা সম্পূর্ণরূপেই মানবসম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ নিয়েই এখন তোলপাড় চলছে সারা দুনিয়াজুড়ে। প্রযুক্তি নির্ভর এ ডিজিটাল বিপ্লবকেই বলা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। বিশ্ব এখন জোর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দিকে। বাংলাদেশও রয়েছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে।

সম্প্রতি সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বার্ষিক সম্মেলনে আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। সারা বিশ্বের রাজনৈতিক নেতা, বহুজাতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ ও বিশ্লেষকরা ডিজিটাল শিল্পবিপ্লব নিয়ে বহুমুখী আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

অবশ্যম্ভাবী এ শিল্পবিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও কীভাবে কল্যাণমুখী করা যায়, সে বিষয়ে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির চাকা আরও গতিশীল করার দিকে মনোনিবেশ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের সম্প্রতি প্রকাশিত ডিজিটাল ডিভিডেন্ডস শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে এখন একদিনে বিশ্বে ২০ হাজার ৭০০ কোটি মেইল পাঠানো হয়, গুগলে মানুষ প্রতিদিন ৪২০ কোটি বার বিভিন্ন বিষয় খুঁজে থাকে। এক যুগ আগেও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এ পরিবর্তনগুলো ছিল অকল্পনীয়। ডিজিটাল এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনকেই বলা হচ্ছে 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই ডিসেম্বর ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত 'International Conference on 4th Industrial Revolution 2021-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মূলত তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বিপ্লব। এ বিপ্লবের ফলে নানামুখী সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে দেশের সামগ্রিক চালচিত্রে। যেমন– অটোমেশনের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস, উৎপাদন শিল্পে নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে বড়ো পরিবর্তন, বিশেষায়িত পেশার চাহিদা বৃদ্ধি, সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

এ বিপ্লব অর্জনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখবে ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেক ভালো করেছে এবং বর্তমান বিশ্বের আধুনিক সব তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে কাজ করে যাচ্ছে।

আগামীর প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতেও প্রস্তুত হচ্ছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উভয় খাতকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও ই-গভর্নেন্স, সার্ভিস ডেলিভারি, পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ইমপ্লিমেনটেশন, তথ্যপ্রযুক্তি, বিকেন্দ্রীকরণ, নগর উন্নয়ন ও পরিকল্পনা এবং এসডিজি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও প্রশাসনিক নীতি কৌশল নিয়ে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের ক্লাউড সার্ভার, ইন্টারনেট অব থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, আর এজন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হবে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা।

বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৬ লাখ যা মোট জনসংখ্যার ৩০%। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছরজুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সব থেকে বড়ো হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্পবিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে বিপুল পরিমাণ মানুষ চাকরি হারালেও এর বিপরীতে সৃষ্টি হবে নতুন ধারার নানাবিধ কর্মক্ষেত্র।

এই বিপ্লবের ফলে দেশের মানুষের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনমান বাড়বে। এছাড়া মানুষ তার জীবনকে বেশি মাত্রায় প্রযুক্তি নির্ভর করবে। আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ থেকে সহজতর হবে। ফলে বহির্বিশ্বের আধুনিক জীবন ও জীবিকার উপকরণ দ্রুত পৌঁছে যাবে মানুষের হাতে। দেশে বর্তমানে সাড়ে ছয় লাখের বেশি তরুণ-তরুণী অনলাইনে কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। দেশীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার রপ্তানির হার দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এর বাজার সামনে আরও বিস্তৃত হবে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে পুঁজি করে কর্মসংস্থানকারীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গী করতে দেশের সাবমেরিন ক্যাবলের সক্ষমতাকে আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি দেশের নির্মিত ও নির্মাণাধীন হাইটেক পার্কগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তির মধ্যে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি যন্ত্রগুলো আপডেট করার পাশাপাশি প্রযুক্তির নিরাপত্তা ঝুঁকি আপডেটের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পুরো জীবনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষ, প্রকৃতি এবং সমাজের সম্পর্ক বৃহত্তর রূপান্তর হতে পারে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় বাংলাদেশের ৮ কোটি ২২ লাখ নারীর হাতকে কাজে লাগাতে পারলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব। একজন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া মানে গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা। জাতির কল্যাণ ও অগ্রগতিতে নারীশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে নারীদের অবাধ প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এদেশের নারীরা।

এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। নারীর উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। নারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শিল্পবিপ্লবের মহাসোপানে বাংলাদেশের নারীরা আজ আদর্শ ও নির্ভরযোগ্য।

বর্তমানে শিক্ষার যে ধরনটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে, সেটি হলো– স্টেম এডুকেশন। সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথমেটিক্স–এই চারটি বিষয়ের আদ্যক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে স্টেম (STEM) এডুকেশন। উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করে তুলছে স্টেম এডুকেশন। তাই স্টেম শিক্ষাকেই শিল্পবিপ্লবের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকার ইদানীং স্টেম শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশে এখন স্টেম শিক্ষার প্রতি নারীদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) বিষয়গুলোতে দক্ষতা অর্জন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নারীর কর্মশক্তি বাড়াবে। স্টেম শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এবং একুশ শতকের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তোলা। প্রযুক্তির বিকাশ মানবসভ্যতাকে প্রগতিশীল করেছে। স্টেম শিক্ষা মানুষের সৃজনশীলতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। স্টেম শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বলা যায়, মানুষের মধ্যে উন্নতমানের টিম ওয়ার্ক, উন্নত যোগাযোগ, কোনো কিছু খুঁজে বের করার দক্ষতা, কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, যে-কোনো সমস্যার সমাধান করা, সর্বোপরি ডিজিটাল জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলাই হচ্ছে STEM-এর কাজ। বাংলাদেশের মেয়েরা এখন দেশের সেরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। নারীদের স্টেম শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। প্রকৌশল এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-র মতো চাকরিতে বাংলাদেশ সরকার নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ টেকনোলজি (NCST) গঠন করেছে। সারা দেশে ৫ হাজারের বেশি ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। স্মার্ট এনআইডি, ইউনিক আইডির বায়োমেট্রিক ডাটাবেস, আঙুলের ছাপ এবং আইরিস স্ক্যানের মতো ডিজিটাল পরিষেবাগুলো এখন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের নারীরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের দারিদ্র্যবিমোচনসহ সাধারণ জনগণের জীবনমান পরিবর্তন করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীত করতে সহায়তা করছে।

সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাস, জিডিপি বৃদ্ধি এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সরকার ডিজিটাল সরঞ্জাম পরিচালনা এবং দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে দেশের নারীদের-পুরুষদের সমান তালে এগিয়ে যেতে নানান সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। পুরুষ এবং নারীদের যৌথভাবে প্রযুক্তিতে সচেতনভাবে দক্ষতা বাড়াতে পেশাগত এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নারীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পে শিক্ষার্থী, ফ্রিল্যান্সার, উদ্যোক্তা, পেশাজীবী, গ্রামের বেকার নারীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। মূলত নারীকে প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করে তুলতে 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং', 'বাড়ি বসে বড়োলোক', 'মোবাইল প্রশিক্ষণ' প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণগুলো নারীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে আরও দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলছে। প্রযুক্তি

করে দিচ্ছে। STEM ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে বাংলাদেশের নারীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (4IR)-এর নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে স্টেম শিক্ষার দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের সারিতে দাঁড় করাতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা 4IR বাংলাদেশের অন্যতম আলোচিত বিষয়। আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স অ্যান্ড জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তা গড়ে ওঠার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের মূলশক্তি হবে নারী। অনলাইনভিত্তিক ই-কমার্স, এসএমই ও অন্যান্য খাতে নারীরা যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে নারীদের ভূমিকাই প্রধান হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। ৮ই মার্চ ২০২২ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতীয় প্রেসক্লাবে নারী ঐক্য পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। ড. আতিউর

আরও বলেন, সারা বিশ্ব এখন যুদ্ধ অবস্থায় বিরাজ করছে। ইতোপূর্বে কোভিডকালে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বৈষম্য, সহিংসতা, বেকারত্ব, বাল্যবিবাহ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। যার সরাসরি শিকার হয়েছে নারী। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান শিকারও তারাই। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নারী-পুরুষ সমতা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কোডার্স ট্রাস্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, বাংলাদেশি আমেরিকান আইটি উদ্যোক্তা আজিজ আহমদ প্রশিক্ষিত নারীদের বিশ্ববাজারে আইটি খাতে কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আসুন আমাদের সঙ্গে যোগ দিন, আমরা আমাদের নিজেরাই নিজেদের জন্য সহায়ক হয়ে উঠি, একে অপরের জন্য সহায়ক হই, সহায়তার হাত বাড়াই তাদের জন্যও যারা আমাদের কাছে অচেনা।

বাংলাদেশের সুধীজনেরা বলেন, আজ যে শিশুরা স্কুলে যেতে শুরু করল, তারা যখন কর্মজগতে প্রবেশ করবে তখন এই সময়ে যেসব কাজ বর্তমান রয়েছে তার অধিকাংশেরই অস্তিত্ব থাকবে না। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সময়ে প্রতিনিয়ত কাজের ধরন পালটে যাচ্ছে। প্রত্যেককে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর দক্ষতাই দিতে পারবে সে পরিবর্তনের সুযোগ। বাংলাদেশকে তারুণ্যের দেশ হিসেবে উল্লেখ করে তারা বলেন, দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নীচে। এই তারুণ্যের শক্তিই দেশকে তার সাফল্যের পথে এগিয়ে নিচ্ছে। আর নিঃসন্দেহে এই ৬৫ শতাংশের অর্ধেকই নারী।

করোনা পরিস্থিতির কারণে দেশের তথা গোটা বিশ্বের স্বাভাবিক পথচলা ব্যাহত হয়েছে। তবে এ পরিস্থিতি সবাইকে শিখিয়েছে আইটি দক্ষতাই দিতে পারে এমন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি।

আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এরইমধ্যে নারীরা সফলতার মুখ দেখছেন। তাদের সামনে নতুন সম্ভাবনাময় জীবনে সবাই সবার হাত ধরে এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের নারীদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (4IR)-এর নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে সুযোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ন করেন। একসময় বাংলাদেশের প্রশাসনে নারীর পদচারণা তেমন লক্ষ করা যায়নি। কিন্তু নারীরা এখন প্রথম সচিব, জেলা জজ, জেলা পুলিশ সুপার (এসপি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ইত্যাদি পদে সফলতার সঙ্গে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি চাকরির পাশাপাশি কৃষি-শিল্পসহ সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। নারীর শিক্ষা অর্জন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নারীরা আজ ঘরে-বাইরে সর্বত্র কাজ করছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল শিক্ষা, বাংলাদেশের নারী-পুরুষের মেধাকে আন্তর্জাতিকভাবে বিকশিত করবে, নারীকে করবে আরও ক্ষমতায়িত।

নারী-পুরুষের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশ যেমন এগিয়ে যাবে, তেমনি দেশের উন্নয়নে নারীদের অবদান আরও বৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটবে। কাজেই নারীর ক্ষমতায়নে আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এমন দিন নিশ্চয়ই খুব দূরে নয় যখন নারীরা বাংলাদেশকে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষিত জাতি হিসেবে বিশ্বাঙ্গনে তুলে ধরতে অন্যতম কাণ্ডারি এবং প্রভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হবে।

ড. শিল্পী ভদ্র: লেখক ও গবেষক, drshilpi.dipa@gmail.com

বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্‌বোধন

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন ১০ই অক্টোবর শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর উদ্‌বোধন করেন। রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং বিসিক চেয়ারম্যান মুহ. মাহবুবর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, জীবনাচার, রাজনৈতিক দর্শন, নেতৃত্বগুণ, দেশপ্রেমসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিসিক-এর উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে। এ কর্নারের উদ্দেশ্য হলো সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ, তাদের নৈতিকতা ও মননশীলতার উন্নয়ন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত করা।

মন্ত্রী আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এ দুটি নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশকে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি, লাল-সবুজের পতাকা পেয়েছি। এই 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর মাধ্যমে বিসিক এক হাজার ৭০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বিসিকের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সোনার বাংলা বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

উল্লেখ্য, বিসিক ভবনের 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে 'জনকের ডাকে জাতির মুক্তি' শিরোনামে শিল্পকর্ম স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্ম থেকে মৃত্যু, বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ও ব্যক্তি জীবন, রাষ্ট্র পরিচালনা সব পর্যায়ের ফটোবায়োগ্রাফি দিয়ে কেন্দ্রটি সাজানো হয়েছে। এছাড়া স্থান পেয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রসহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্লভ দলিল, দেশি-বিদেশি পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ সময়কার প্রকাশিত সংবাদের ছবি ও আলোকচিত্র। আরও রয়েছে বঙ্গবন্ধুর হাতে লেখা বেশ কিছু চিঠি, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বিভিন্ন বই।

প্রতিবেদন: মৌসুমি আক্তার

হেমন্তকাল উৎসবের ঋতু

হাছিনা আক্তার

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দুই মাস নিয়ে হেমন্তকাল। এই ঋতুকে শীতের পূর্বাভাসও বলা হয়। প্রকৃতিতে বছর ঘুরে শরতের পর হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। হেমন্তের বিকেলগুলো হয় স্বল্পায়ু। সন্ধ্যা নামতেই মিলে শীত শীত মিষ্টি অনুভূতি।

প্রথম ফসল গেছে ঘরে;
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশ-পাতা-মরা ঘাস-আকাশের তারা!
বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!
ধানক্ষেতে–মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা!
ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়াছে এ-পৃথিবী,

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি*'র (পেঁচা মাঠের গল্প) কবিতায় হেমন্তের এমন বর্ণনা দিয়েছেন। একসময় এ ঋতুর সঙ্গে মানুষের হাসিকান্না জড়িয়ে থাকত। সকালের শিশিরভেজা ঘাস, হালকা কুয়াশা, মাঠের পাকা সোনালি ধান, কৃষকের পাকা ধান ঘরে তোলার দৃশ্য এবং কৃষক-কৃষানির আনন্দ সবই হেমন্ত ঋতুর রূপের অনুষঙ্গ। মিষ্টি আবহাওয়া আর উৎসবমুখর পরিবেশের সংমিশ্রণের নামই হেমন্ত।

'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে/অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;/মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার, চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,/তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান ...।'

বাংলার হেমন্তকাল *ধূসর পাণ্ডুলিপি*'র কবি জীবনানন্দ দাশেরই। ভোরের কাক হয়ে কিংবা শঙ্খচিল, শালিকের বেশে তিনি তাঁর কবিতায় নবান্নের দেশে ফেরার আকুতি জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার্তিকের ঋতু হেমন্তকে নিয়ে লিখেছেন– 'আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে/জনশূন্য ক্ষেত্র মাসে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে/ শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার/ রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার/ স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি।'

বাংলায় শরৎ আসে নববধূর মতো আর হেমন্ত আসে কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল নিয়ে। মিষ্টি রোদের আদর। হালকা শীতের রাত। প্রকৃতির নিয়মে হেমন্ত নিয়ে আসে মাঠে মাঠে সোনালি ধান। মাঠভরা নতুন ধানের মিষ্টি গন্ধে খুশিতে নেচে ওঠে গৃহস্থ পরিবারগুলো। জনজীবনে হেমন্ত আনন্দ-বেদনার কাব্যের মতো। এ ঋতুতেই দেখা যায় পাতাঝরা বৃক্ষের নৃত্য।

হেমন্ত বিচিত্র ও বৈচিত্র্যময় ঋতু। দীর্ঘ তাপদাহের পর এ রূপ প্রশান্তির হয়ে দেখা দেয়। হেমন্তের রূপ দেখতে হলে পাড়াগাঁয়ে যেতে হয়। যেখানে বিস্তীর্ণ মাঠে নামলে, খালি পায়ে চললে হাতের কাছেই কুয়াশার দেয়াল দেখা যায়। পত্রপল্লব হরিদ্রাভ সাজবরণ করে। কাঁচা সোনার রং লেগে যায় দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠে। পাকা ধানের ম-ম গন্ধে ভরে ওঠে চারদিক। শরতের শেষে বায় হেমন্ত, হেমন্তের অন্তে শীত বলে দুই ঋতুকেই ছুঁয়ে দেখে এই ঋতু। অনেকের ভাষায়, শরৎ আর শীতের সেতুবন্ধ হেমন্ত। হেমন্ত মানেই কৃষকের মুখে অনাবিল হাসি। ধান কাটা-মাড়াই নিয়ে পরিতৃপ্তির ব্যস্ততা। চলতে থাকে নবান্নের পিঠা-পায়েসের আয়োজন।

হেমন্তের আগমনি, এর প্রকৃতি ও স্বভাবের এক চঞ্চল রূপ এঁকেছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতায় তিনি লিখেছেন–

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের আঘ্রানে আজি অঘ্রান হল মাৎ।
গিন্নি-পাগল' চালের ফিরনী
তশতরী ভরে নবীনা গিন্নী
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশীতে কাঁপিছে হাত।
শিরনী বাঁধেন বড়ো বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেসমাত!

মিঞা ও বিবিতে বড় ভাব আজি খামারে ধরে না ধান।
বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!
'শাশবিবি' কন, 'আহা, আসে নাই
কতদিন হল মেজলা জামাই।'
ছোট মেয়ে কয়, 'আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান!'
দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো-বিবি লবেজান!

হল্লা করিয়া ফিরিছে পাড়ায় দস্যি ছেলের দল!
ময়নামতীর শাড়ী-পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল!
নতুন পৈঁচি-বাজুবন্দ পরে
চাষা-বৌ কথা কয় না গুমোরে,
জারীগান আর গাজীর গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল!
বৌ করে পিঠা 'পুর'-দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল!

মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান।
রাখাল ছেলের বিদায়-বাঁশীতে ঝুরিছে আমন ধান!
কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালী সুর
রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর!
ধান ভানে বৌ, দুলে দুলে ওঠে রূপ-তরঙ্গে বান!
বধূর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ!

হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত!
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য আলো-সরিৎ!
দিগন্তে যেন তুর্কী-কুমারী
কুয়াশা-নেকাব রেখেছে উতারি!
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ,
নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হল হরিৎ পাতারা পীত!

নবীনের লাল ঝান্ডা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,
রক্ত নিশান নহে যে রে ওরা রিক্ত শাখার জয়!
'মুজ্‌দা' এনেছে অগ্রহায়ণ–
আসে নৌরোজ খোল গো তোরণ!
গোলা ভর রাখ সারা বছরের হাসি-ভরা সঞ্চয়।
বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয়!

একদা হেমন্ত ছিল ভরা যৌবনা। টলটলা, যখন ধানের, গমের, কৃষি উত্তাল প্রকৃতি ছিল এই দেশে, ছিল বৈশ্বিক উষ্ণতার করাল থাবার বাহিরে এখনও হেমন্তে ধান ওঠে কমবেশি, এখনও পিঠাপুলির ধুম পড়ে ঘরে ঘরে। হেমন্ত মেলা বসে গঞ্জে, ঘাটে, সড়কে, মোড়ে। এখনও হেমন্তের আমেজ দেখা যায় প্রকৃতির মাঝে। হয়ত মানুষের আগ্রহ কমেছে ঋতুর বৈচিত্র্যে, প্রয়োজন কমেছে ঋতুভিত্তিক কর্মে; নাগরিক মস্তিষ্ক, নগর ইট-কাঠ, কারখানা নগদ অর্থ ভুলিয়েছে ঋতুর রীতিনীতি তবুও প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে, সূচি মাফিক নিয়ে আসে ঋতুর এক এক পর্ব, ধাপে ধাপে বদলায় তার বৈশিষ্ট্য।

সভ্যতার বিবর্তনে, কালপরিক্রমায় নগরায়ণের তুমুল প্রতিযোগিতায়, বৈশ্বিক টানাপড়েনে হেমন্তের পূর্ণ আবির এখন আর চোখে পড়ে না। সব ঋতুই এখন আসে, কিছুটা আগে নয় তো কিছুটা পরে। ঋতুগুলো রূপের রঙের বিভাবরীতে অনেক মলিন হয়ে পড়েছে। ঋতুর খোঁজ রাখি বা না রাখি বাংলার আকাশে-মাটিতে আরও বহুকাল একান্ত আপন শ্রী নিয়ে ফুটে উঠবে হেমন্ত। প্রকৃতির প্রতি আমাদের অধিক অনাচার হেতু আমরা এই ঋতুর জৌলুস থেকে হয়ে পড়ছি বঞ্চিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পালটে গেছে ঋতু পরিবর্তনের আবহমানকালের পাণ্ডুলিপি। ফলে বাস্তবে এ ঋতুর আবেশ বাঙালির ঐতিহ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

হাছিনা আক্তার: সিনিয়র সম্পাদক, ডিএফপি, ঢাকা

শেখ রাসেল দিবস

১৮ই অক্টোবর দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় দিবস হিসেবে সারা দেশে একযোগে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে পালিত হয় শেখ রাসেল দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য হলো– 'শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক, দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক'। দিবসটি উপলক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে সকাল ৬টায় বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়। সকাল ৬:৩০ টায় স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৭টায় পরিকল্পনা কমিশনের সামনে বিআইসিসি প্রাঙ্গণে সকলের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) হল অব ফেম-এ শেখ রাসেল দিবস-এর উদ্‌বোধন ও শেখ রাসেল পদক প্রদান করেন। দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, হল অব ফেম-এ দুপুর আড়াইটায় 'শেখ রাসেলের নির্মম হত্যাকাণ্ড: ন্যায় বিচার, শান্তি ও প্রগতির পথে কালো অধ্যায়' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার, এই স্থানে সন্ধ্যা ৬টায় 'কনসার্ট ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস' অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে পক্ষকালব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়াও ১৬ই অক্টোবর রাত ৯টায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে 'Tragic End of Sheikh Russel: A Shame In Human History' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

দিবসটি উপলক্ষে দেশের সকল বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন, দাবা, জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, শেখ রাসেলের এই অকাল প্রয়াণে সুখ-দুঃখ হয়ত কোনোদিন আমাদের শেষ হবে না। শেখ রাসেল দিবসে সারা দেশের সাড়ে তিন কোটি শিশু-কিশোরদের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, শেখ রাসেলের নির্মলতা, তার দুরন্ত এবং নির্ভীক শৈশবের গল্প সেটি আমরা পৌঁছে দিতে চাই।

প্রতিবেদন : ইশরাত হক

৭ই নভেম্বর ২০২২, ১০০ সেতুর উদ্‌বোধনী ক্রেস্ট হাতে হাস্যোজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি

১০০ সেতু উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই নভেম্বর ২০২২ গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি একযোগে ১০০টি সেতু উদ্‌বোধন করেন। এসময় তিনি বলেন, এটি দেশের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো আমরা ১০০টি সেতু উদ্‌বোধনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে দ্রুততর করতে পারব।

৮৭৯ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে ২৫টি জেলায় ১০০টি সেতু যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেতুগুলো জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করবে।

শেখ হাসিনা বলেন, যে-কোনো দুর্যোগে মানুষকে সাহায্য করা সহজ হবে, পণ্য পরিবহণ এবং বিপণন দ্রুত এবং সহজ হবে। সেতুগুলো রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে, কারণ এগুলো ৩৩টি রুট ফেরি পরিষেবা থেকে মুক্ত করেছে, যা সড়ক যোগাযোগকে অবাধ, দ্রুত, সহজ এবং নিরাপদ করবে।

সেতুগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৬টি, সিলেট বিভাগে ১৭টি, বরিশাল বিভাগে ১৪টি, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগে সাতটি, ময়মনসিংহ বিভাগে ছয়টি এবং রংপুর বিভাগে তিনটি রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গত প্রায় ১৪ বছরে আমরা বিভিন্ন মহাসড়কে ১ লাখ ১৩ হাজার ৩০৩ মিটার সেতু নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ এবং ২১ হাজার ২৬৭ মিটার কালভার্ট নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করেছি। তিনি বলেন, সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু নির্মাণকাজ সমাপ্তকরণসহ খুলনা, পাকশী ও আশুগঞ্জে তিনটি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করা হয়, যা মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে নিরবচ্ছিন্ন

করে তোলে। তাঁর সরকার ১৯৯৬ থেকে ২০০১ মেয়াদে একুশ বছর পর ক্ষমতায় এসেই সেসময়ে ১৯ হাজার বৃহৎ, মাঝারি, ছোটো সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করে।

– সচিত্র বাংলাদেশ ডেস্ক প্রতিবেদন

হেমন্ত বাঙালির শস্যের দিন

ফারুক নওয়াজ

মাঠে মাঠে ফলে সোনালি শস্য
বনে বনে কত পাখি–
রৌদ্র-ছায়াতে মমতা-মায়াতে
কত সুখ মাখামাখি।...
ছয়টি ঋতুর রূপের মাধুরী
আহা কী মধুর ছবি–
এ দেশ আমাকে আবেগে দোলায়
হয়ে যাই আমি কবি।...

কবির প্রাণের স্বদেশ আমাদের প্রিয় স্বদেশ ভূমি বাংলাদেশ। সুজলা-সুফলা মৃত্তিকার নদীমেখলা প্রিয় জন্মভূমি আমার। জগতের সেরা শস্যভাণ্ডার এই পললভূমির সরস বদ্বীপ। নদীধোয়া বিচিত্র মৃত্তিকা স্তরের দেশটিতে বারো মাসই ফলে নানা শস্য।

ধানের দেশ, গানের দেশ। প্রাণের শস্যভূমির ধানেরই কত নাম। আউশ, আমন, বোরো– তিন জাতের ধানের কত যে প্রকৃতি। কত নাম বলব? আউশের ক্ষেতে জলে ভরভর– হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের সেই আউশেরই নানা নাম। হাসিকলমি, দুলার, পানবিড়া, কটকতারা, ধাড়িয়াল, চান্দিনা, মালা, দুলাভোগ, মুক্তা, ময়না, মোহিনি, পায়জাম, শ্রাবণী, হাসি, আশা আরও কত কী! আছে বিচিত্র আমন– বাদশাভোগ, লতিশাইল, রাজাশাইল, কিরণ দিশারী, বিনাশাইল, পূর্বাচী, ভরসা– এমনই সব মনকাড়া ধানের জন্মভূমি এই বাংলা।

সেই ছড়ার আদর– উড়কি ধানের মুড়কি আর বিন্নি ধানের খই। সেই শালিধানের চিড়াও কি কম স্বাদের। এ তো গেল ধানের কথা।

বিচিত্র শস্যবীজের কথা না বললে কি হয়। কত যে ডালের ধরন। মুগ, মশুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাষকলাইয়ের পাশাপাশি সরিষা, তিল, তিসি ছাড়াও অধুনাকালে সয়াবিন, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, কুসুমও এদেশের অন্যতম তৈলবীজ।

আছে আখ, খেজুর, তাল, বিট ইত্যাদি মিষ্টি ফসল, যা আমাদের চিনি ও গুড়ের অভাব মেটায়। বছরভর বিচিত্র ফলমূল আর শাকসবজির ফলন আমাদের বারোমাসি খাদ্যতালিকায় যুক্ত হয়ে ক্ষুধার আহার হয়ে প্রাণশক্তি ও স্বাদে মুগ্ধ করে।

আমাদের ধূসর মাটির সবুজ আস্তরণ ঘাস। যেন সবুজ গালিচা। হেমন্ত আর শরতের শিশির ধন্য হয় ঘাসের আদরে। বিচিত্র নামের সেই ঘাসের কথা না বলে থাকি কী করে? কয়টা ঘাসের নাম জানো তোমরা? হয়ত মুথাঘাস চেনো। তারাঘাসও মনে হয় চেনো। কিন্তু ঘাগরা, প্যারা, গিনি, নেপিয়ার, তুরমা, ওট, দূর্বা, ঝরাধান, প্যাংগোলা, সিগনাল– এসব ঘাস দেখেছ কি? নানা রঙের ঘাস হয় কিন্তু।

ঘাসের মতো অনেক গাছও আমরা চিনি না। কিন্তু দেশকে ভালোবাসতে হলে দেশের প্রকৃতিকে চিনতে হবে। দেশের লতাপাতা, গাছপালাকে চিনতে হবে। আমরা অনেক গাছ চিনি, নাম জানি। আবার অনেক গাছ দেখি কিন্তু নাম জানি না। আবার অনেক গাছের একাধিক নাম। যেমন: ঝাউ। আমি কিন্তু ঝাউকে ঝাবুক নামেও ডাকতে পারি। তুমি পারুল বলো যাকে, আমি ধারমারা বললে– তাও ওই পারুল গাছকেই বোঝাবে। আর নানা নামের কত যে গাছ আছে। যেমন: কাঞ্চন, কুলাঞ্জনা, শ্বেতশিমুল, হারগোজা, আপাং, গুটগুটিয়া, কেশরাজ, পুনর্ণভা, বিচতরাক, বনওকরা, যজ্ঞডুমুর, উড়িআম, আমরুল, অরবরি, গন্ধবাদালি, আয়াপান, কুঁচ, তোকমা, কাউয়াঠুঁটি, নাতা করঞ্জা, রিঠা, তেলশূড়, বিলিম্বি, জুতা শালপানি, কুকশিমা, ডেওয়া, কাও, খৈয়ে, কুম্বি, বেড়েলা, চাকুলিয়া– আর কত বলব। বলতে বলতে রাত কাভার হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, তোমরা যাকে তেঁতুল বলো, আমি তাকে ইমলি বা তিন্তিড়ি বলেও ডাকতে পারি। আমাদের দেশ হাজারো লতা-পুষ্প, তরুলতার দেশ।

আমার উদ্দেশ্য হেমন্ত বা নবান্নের পাখি নিয়ে কিছু বলা। কিন্তু চলে এল ধান-শস্য, তরুলতার কথা। আসলে, পাখির কথা বলতে গেলে ওসবের কথা এসে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি গাছপালা, নদনদী, ঘাস-শস্য এদেশে না থাকত তাহলে পাখিও থাকত না। বনের পাখি, জলের পাখি বা ডাঙার পাখি– সব পাখির বেঁচে

থাকার জিয়নকাঠি সবুজ বনভূমি, জল আর শস্যদানা।

হাজারো পাখির দেশ বাংলাদেশ। বারো মাস পাখির কাকলিতে মুখর থাকে আমাদের প্রকৃতি। দেশি পাখিরা তো আছেই, তারসাথে শীতের আগমনি বারতা পেয়ে বিদেশি অর্থাৎ বরফঢাকা দেশের পাখিরাও এদেশে এসে কলকাকলিতে মেতে ওঠে। এদের পরিযায়ী বা অতিথি পাখি বলে জানি আমরা। সাইবেরিয়াসহ প্রাচ্যের নানা অঞ্চল থেকে এরা আসে। এরা মূলত হাঁসপ্রজাতির পাখি।

আমি হেমন্তের মানে নবান্নের পাখিদের নিয়ে আলোচনা করব। আসলে নবান্নের পাখি মূলত বাংলার সব পাখিই। কত পাখি আছে আমাদের দেশে? এমন প্রশ্নের টাইটাই হিসাব কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পক্ষীগবেষকরা একটা মোটামুটি হিসাবে মনস্থির হয়েছেন। পৃথিবীতে মোট ২৩টি বর্গের ১৪২টি গোত্রের মোট ৯ হাজার ১ শত ৯৮ প্রজাতির পাখির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশে আছে মাত্র ৬৮টি গোত্রের পাঁচশোর মতো পাখি। এ হিসাবটা এক যুগ আগের। গবেষণা করে বের করেছেন প্রখ্যাত পাখিবিজ্ঞানী ড. রেজা খান।

বাংলাদেশের পাখিদের মধ্যে গ্রামবাংলায় যেগুলোকে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলো হলো– দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, ঘুঘু, ময়না, টিয়া, শালিক, কসাই, তোতা বা লালবুক টিয়া, পেঁচা, পায়রা, বাঁশপাতি, টুনটুনি, বক, বাবুনাই বা স্বেতাক্ষি, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, বুলবুল, বাতাসি, কানাকুয়ো, চাতক, বটেরা, পানকৌড়ি, ডাহুক, কোয়েল, খঞ্জনা, পাপিয়া, জপদস্যু, জলময়ূর, জলপায়রা, ঈগল, গান হলুদ। হেমন্ত ফসলের মৌসুম। শস্যের ঘ্রাণে এসময় পল্লির বাতাস মউমউ করে ওঠে। ঘরের পাখি, উঠোনের পাখিগুলো তো সেসময় বড়ো আনন্দে থাকেই। আর জলের পাখি, বনের পাখি, চরের পাখি, আকাশের পাখি এরা ঘ্রাণে ছুটে আসে ঝরাধানের ক্ষেতে, চাষির খামারে শস্যকণা আর পোকামাকড়ের টানে।

তবে খুব কাছের পাখি যারা অর্থাৎ যারা গেরস্তের বাড়ির আতা-চালতার ডালে দিনমান ডাকে, ডানা ঝাড়ে বা ঝিমায় তারা, আর ঘরের পাখি মানে, চড়ুই, পায়রা, দোয়েল, ফিঙে– এরাই হচ্ছে মূলত নবান্নের পাখি। এরা পুরো হেমন্তজুড়ে গেরস্তের উঠোন, গোলা, ঢেঁকিশালের আশপাশেই থাকে। এসব জায়গায় সাধারণত খুদ-কুনো, শস্যদানা ছড়িয়ে থাকে। ওরা সুযোগমতো আহার খুঁটে খুঁটে খায় সারা দিন। হয়ত কাকটাও এসে বসে থাকে মাচার উপর। সেও সুযোগ খোঁজে চাষি বউয়ের শুকোতে দেওয়া লংকায় ঠোঁট বসিয়ে নিয়ে পালানোর তালে। হয়ত পড়ে আছে কোথাও পিঠার টুকরো বা মাছ-মাংসের অংশ, হাড়-কাঁটা। ওদের নজর থাকে সেদিকে।

আর যে পাখি দুটি সত্যিকারের ষোলোআনা নবান্নের পাখি তারা হচ্ছে, বউ কথা কও এবং কুটুমপাখি। পুরোটা হলুদই, তবে বুক-গলা-মাথা আর শরীরের কিছু অংশ কালোর ছোপ। এই কুটুমপাখি তাই হলদে পাখি নামেই গ্রামবাংলায় বেশি পরিচিত।

হ্যাঁ, হলদে পাখিই নবান্নের পয়লা নম্বর পাখি। এরা আনন্দের সংবাদ বয়ে আনে চাষির শস্যগন্ধ বাড়িতে। এদের ডাকটি অনেকটা 'কুটুম কুটুম' স্বরের। গ্রাম্য মানুষের বিশ্বাস এরা বাড়ির আতা কিংবা বুড়ো আমগাছে বসে বসে এমনি এমনি ডাকে না। এরা ঘরে কুটুম বা অতিথি আসার আগাম সংবাদ দেয়। আসলে এই নবান্ন মূলত পল্লিবাংলার আতিথ্যের কাল। ফসল তুলে ঘরে আনার পর মাঠের কাজ আর থাকে না তখন। মেয়ে আসে বাপের বাড়িতে, সাথে শ্বশুরবাড়ির আরও দু-চারজন আসে। জ্ঞাতি-কুটুমেরা বেড়াতে আসে স্বজনদের দেখতে। হলদে পাখি না ডাকলেও তারা আসবে।

নবান্নের দ্বিতীয় পাখি বউ কথা কও। নামটা হয়েছে ওই কুটুমপাখির মতোই ডাকের কারণে। ওদের ডাকের তর্জমা– বউ কথা কও-বউ কথা কও...। হেমন্তে ওদের ডাকের ধরনটা অবশ্য আরও সুরেলা এবং আবেগময় হয়ে ওঠে। সবার বিশ্বাস এ পাখি যে গেরস্তের বাড়ির সীমানায় ডাকবে সে বাড়িতে বিয়ের খবর হয়। এখানেও ব্যাপারটা কিন্তু একই। এই মৌসুম স্বভাবতই বিয়ের। গেরস্তদের ছেলেমেয়ে-স্বজনদের বিয়ের কাজটা এসময় সেরে নিতে সবাই মুখিয়ে থাকে, যেহেতু সময়টা প্রাচুর্যের। নতুন ফসল মানেই অর্থনৈতিকভাবে সবাই বেশ স্বস্তিতে থাকে। সময়টাই অনুষ্ঠান-আনন্দের। আবহমান গ্রামবাংলার নবান্নের এই মৌসুম প্রকৃত অর্থেই শস্যময়, পাখিময়, আনন্দময়। নবান্নের এই সুখ চিরকাল থাক। বাতাসে ছড়িয়ে যাক শস্যের মায়াবী ঘ্রাণ। শস্যের গন্ধে আসুক হাজারো বিহগ। মাতুক আনন্দ কলস্বরে। হিমঝুরি, জারুলের ঘ্রাণে হোক উদাস মধুপ।

ফারুক নওয়াজ: কবি ও প্রাবন্ধিক

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু চেয়ার এবং ডিনস অ্যাওয়ার্ড

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, মতাদর্শ, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য চালু হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার'। নীতিমালায় বঙ্গবন্ধু চেয়ার পদে নিয়োগ ও কার্যকালে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশ করা প্যানেলের মধ্য থেকে সিন্ডিকেট বঙ্গবন্ধু চেয়ার পদে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করবে। বঙ্গবন্ধু চেয়ার পদে নিয়োজিত ব্যক্তি পদাধিকার বলে বা অন্য কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো পদে নিয়োজিত হবেন না। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে কৃতিত্বপূর্ণ ফল অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হবে 'ডিনস অ্যাওয়ার্ড'। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদভুক্ত বিভাগের চার বছর মেয়াদি স্নাতক চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী শিক্ষার্থীকে প্রথমবারের মতো এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

ডিনস অ্যাওয়ার্ডের নীতিমালা অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনুষদের আওতাধীন প্রতিটি বিভাগ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী একজন করে শিক্ষার্থী এ ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির জন্য মনোনীত হবেন। অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হতে হলে স্নাতক চূড়ান্ত পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৭৫ থাকতে হবে। একই বিভাগে একাধিক শিক্ষার্থী সমান সিজিপিএ অর্জন করলে, ওই সব শিক্ষার্থীর প্রথম থেকে অষ্টম সেমিস্টার পর্যন্ত প্রাপ্ত মোট নম্বর বিবেচনা করা হবে। এর পরও যদি সমতা থাকে, সেক্ষেত্রে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল বিবেচনা করে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়ন পাবেন।

প্রতিবেদন: পি. আর. শ্রেয়সী

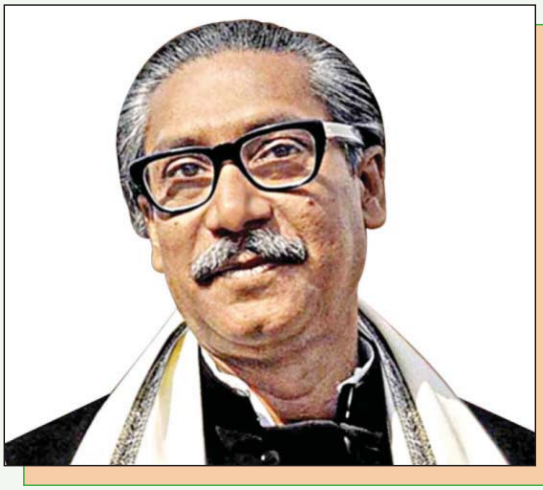

বঙ্গবন্ধুর চেতনায় অর্থনৈতিক মুক্তি

মো. ইলিয়াজ হোসেন (রানা)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না, এটা ছিল একাধারে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। উন্নতর জীবনের প্রত্যাশায় দেশের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। জাতিসংঘের এক হিসাব মতে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১.২ লক্ষ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করা যে-কোনো নতুন সরকারের পক্ষে এক কঠিন কাজ। তাছাড়া ছিল যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রায় ১ কোটি লোকসহ ৩ কোটি গৃহহীন লোকের পুনর্বাসন সমস্যা। স্বাধীনতা লগ্নে বাংলাদেশের না ছিল বৈদেশিক মুদ্রা, না ছিল খাদ্য মজুত। এমতাবস্থায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষ চরম অর্থনৈতিক দুর্দশায় পতিত হয়। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের সুস্পষ্ট আদর্শটি সবকিছুর উর্ধ্বে বিরাজমান ছিল অবিচল আস্থায়। কল্যাণ রাষ্ট্রে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়টি ছিল শেখ মুজিবের অর্থনৈতিক দর্শন। বঙ্গবন্ধুর অর্থনীতির মূল এবং একমাত্র দর্শনই ছিল জনগণের মৌলিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবায় সাংবিধানিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩, ১৪ এবং ১৫নং অনুচ্ছেদে এ সকল অধিকারের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু মুক্তিকামী মানুষের দৃষ্টিতে সমার্থক। তাঁর জাজ্বল্যমান প্রমাণ ১৯৭১ সালে এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, আপনার ৫২তম জন্মদিনে সবচাইতে বড়ো ও পবিত্র কামনা কী? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, জনগণের সার্বিক মুক্তি। তারপর তিনি বেদনাবিধুর স্বরে বলেছিলেন, 'আমি জন্মদিন পালন করি না, আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না, কেকও কাটি না। এদেশের মানুষের নিরাপত্তা নাই। আমার জন্মদিনই কী, আর মৃত্যুদিনই কী? আমার জনগণের জন্যই আমার জীবন ও মৃত্যু।'

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের লায়ালপুর কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বদেশের মাটিতে পা রাখলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দান করে; দেশ ফিরে পায় তার প্রিয় নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তিনি যখন ফিরছিলেন তখন বিমানের জানালা থেকে নীচের জনসমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। এটা দেখে অভিভূত হয়ে তিনি কেঁদেছিলেন। সাংবাদিক আতাউস সামাদ বিমানে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর পাশের আসনেই। তিনি শুনলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন, 'এত মানুষ! ওরা আমাকে এত ভালবাসে; কিন্তু আমি ওদেরকে খাওয়াব কি করে?' দেশ স্বাধীন হবার পরে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতায় ভারত ও ইরাকসহ কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্র খাদ্যসহ নিত্যপণ্য সাহায্য পাঠায়। সুইডেন ও কানাডা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা অনুদান দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ সূচনা করে। নেদারল্যান্ডস একটি প্লান্ট প্রটেকশন উড়োজাহাজ দেয়। ইউএনডিপি পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের ন্যায্য হিস্যা বাংলাদেশকেও ভাগ করে দেয়। যা হোক, ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে মুজিব নগরে ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য অন্যান্য সংস্কারের সাথে সাথে অর্থনৈতিক সংস্কারের নিমিত্তে বেশকিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর অসংখ্য শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অবাঙালি মালিকগণ দেশত্যাগ করলে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সংক্রান্ত আইনটি ১৯৭২ সালের ৩রা জানুয়ারি প্রণীত হয়। ১৯৭২ সালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ১নং আদেশ (APO-1) এবং পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১৬নং আদেশ (PO-16) অনুসারে বাংলাদেশ সরকার ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অব্যবহিত পূর্বে পাকিস্তানিরা ২৮৮.৬০ কোটি টাকা মূল্যের ৭২৫টি ইউনিট পরিত্যক্ত রেখে পালিয়ে যায়। এগুলো ছিল বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পগুলোর মোট অংশের ৪৭ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতের মোট শিল্পের ৭১ শতাংশ। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, যেগুলো এ অঞ্চলের মোট ডিপোজিটের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পাট, বস্ত্র, চিনিকল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণের আওতাভুক্ত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয়করণ আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিসত্ত্ব সরকার গ্রহণ করে এবং সেগুলো ক্রমান্বয়ে ৬টি নতুন ব্যাংকে রূপান্তর করে। জাতীয়করণ আইনের আওতায় ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল এবং ১৫টি চিনিকল জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা যা আগেও সরকারি মালিকানায় ছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে আনা হয়। এভাবে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ জাতীয়করণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসনভার গ্রহণের সময় দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি ছিল কৃষি খাত নির্ভর। আর সেই সিংহভাগ কৃষকের কল্যাণেই তিনি সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। 'কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে'– এটা কেবলই একটা স্লোগান ছিল না, ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচি। মুক্তিযুদ্ধের পর ২২ লক্ষেরও বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করেছিল বঙ্গবন্ধু সরকার। জমির সকল বকেয়া খাজনা মওকুফসহ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে। পরিবার প্রতি সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করে। পাকিস্তান আমলে ১০ লক্ষ কৃষকের বিরুদ্ধে ঋণের সার্টিফিকেট মামলা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সরকার এসব ঋণী কৃষকদের মুক্তি দেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে নতুন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উপহার দেন। তিনি প্রায়শ বলতেন যে, বাংলাদেশের সংবিধান এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হলো বাঙালি জাতির অমূল্য দলিল এবং তা বাঙালি জাতিকে দেশ শাসন ও উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

১৯৭৩ সালের ১লা জুলাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-১৯৭৮ কার্যকর হয়। এই পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস। যার লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিল– কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষিশিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে ৫.৫ শতাংশে উন্নীত করা আর আনুষ্ঠানিক খাতগুলোর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রম বিকাশ মানবশক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য তেল, কেরোসিন, চিনি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজারমূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে রাখা এবং স্থিতিশীল করা (কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে)। বণ্টন নীতিমালা এমন রাখা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা এবং আমদানি কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতাভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমুদ্রসীমা ও মহিসোপানে বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে দাবিনামা পেশ করেন। কূটনৈতিক দক্ষতা, আইনি প্রস্তুতি, সার্ভে ম্যাপ বানানোসহ সবদিক থেকে আঁটসাঁট বেঁধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইতিবাচক রায় পায় যার ফলে বাংলাদেশ লাভ করে ১,১৮,০০০ বর্গমাইল সমুদ্র এলাকা, ২০০ নটিক্যাল মাইল মহিসোপান।

পৃথিবীর সব রাষ্ট্রনায়ক, জননেতাই স্বদেশের মানুষের জন্য ভাবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির চিন্তা ছিল কিছুটা ভিন্নরূপ। বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন প্রাণের তাগিদে। ১৯৭২ সালের ৯ই মে রাজশাহী মাদ্রাসা মাঠে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'আমি জীবনে প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য রাজনীতি করিনি, এক দিকে ছিল প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার আর অন্যদিকে ছিল আমার ফাঁসির কাষ্ঠ। আমি বাংলার মানুষকে মাথানত করতে দিতে পারি না বলেই ফাঁসির কাষ্ঠ বেছে নিয়েছিলাম।' কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় তিনি যে সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলেন তার একমাত্র কারণ ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি। এমনকি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পেছনে পূর্ব বাংলার কৃষকদের জমিদারি ব্যবস্থার শোষণ মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে বড়ো ভূমিকা ছিল। তিনি বলতেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের যুবক শ্রেণি চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।' বাঙালি জনগণের মুক্তি অর্জন, দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গঠন, বাংলার গরিবদুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানো ও সোনার বাংলা গড়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তি চেতনা বুঝতে হলে অবশ্যই তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি বুঝতে হবে। পৃথিবী তখন দুটি ব্লকে বিভক্ত ছিল, একদিকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, চীন অন্যদিকে পুঁজিবাদী শক্তি আমেরিকা। বঙ্গবন্ধু কোনো ব্লকেই যোগ দেননি। তিনি এ ভূখণ্ডের মানুষ, তাদের সংস্কৃতি, মাটির গঠন, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী স্বতন্ত্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এটা শুধু রাজনীতিবিদদের কাজ না, একজন দার্শনিকের কাজ। কিন্তু নানা কারণেই সেগুলো কিছু বাধার সম্মুখীন হয়। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, ব্যাংকে টাকা নেই, কোষাগার শূন্য, সমস্ত অবকাঠামো বিপর্যস্ত, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ভাঙা, ২ কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষক পরিবার তাদের লাঙল-জোঁয়াল, গবাদি পশু রেখে গেছে, বাড়িঘর সব লুটপাট হয়ে গেছে, এমনকি ফিরে যাবার আগে-পরে পাকিস্তানি সেনারা এদেশের গুদামগুলো পর্যন্ত লুট করে গেছে, না পারলে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। দেখলে মনে হতো যেন পারমাণবিক বোমার আঘাতে এক পরিত্যক্ত বিভীষিকাময় ভূখণ্ড।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিপর্যস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন করতে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করলেন, রাস্তাঘাট মেরামত করতে লাগলেন, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করতে লাগলেন। একটি সদ্যোজাত বিপর্যস্ত স্বল্পোন্নত দেশকে কীভাবে একটি শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেলক্ষ্যে তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রণয়ন করলেন। নানান বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি দেশটা এগিয়ে নিচ্ছিলেন স্বীয় মেধা-মননশীলতা-বিচক্ষণতা এবং সীমাহীন দূরদর্শিতায়। তখনই একদল ভিন্ন মতাবলম্বী তাঁকে অসহযোগিতা শুরু করলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের কাছে সামান্য সময় চেয়েছিলেন শুরুর দিকে অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য। কিন্তু সেসময় দিতে রাজি ছিল না এদেশেরই একদল অসহিষ্ণু বিপথগামী তরুণ। তাই আত্মত্যাগ তাঁকেই করতে হয়েছে। পুরো পরিবার নিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসের চতুর্থবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিনি যে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছেলেন তারই মধ্যে নিহিত আছে তাঁর সারা জীবনের অর্থনৈতিক মুক্তি চিন্তার সারমর্ম। অত্যন্ত দুঃখবহ এবং করুণ মৃত্যুবরণ করলেও তিনি একটি মুক্ত এবং স্বাধীন বাংলাদেশ এদেশের মানুষকে উপহার দিয়েছেন, একটি নতুন জাতিসত্তা সৃষ্টি করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু যে অর্থনীতির দর্শন দিয়ে গেছেন সে পথ ধরেই আমাদের প্রত্যাশা মহা অগ্রগতির ধারা আরও বেগবান হবে। পূর্ণ হবে স্বপ্নসাধ। গঠিত হবে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, আশ্রয় প্রবঞ্চনা, অনিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও হানাহানিমুক্ত গণতান্ত্রিক সোনার বাংলা।

১৯৭২ সালে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'Bangladesh is going to be a bottomless Basket.' ১৯৭২ সালের সেই তলাবিহীন ঝুড়ি বহু চড়াই-উতরাই পার হয়ে হাটিহাটি পা-পা করে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের গুণে জাতিসংঘের 'Committee for development policy'-এর ঘোষণানুসারে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা– এই তিন সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়ে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এগিয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে পদার্পণ করতে আর কোনো বাধা রইল না। ২০২১ সালে মুজিব জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন লগ্নে তলাবিহীন ঝুড়ির সেই বাংলাদেশকে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষণা করে।

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল। কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রেখে অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটলেই কেবল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন সফল হবে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম সার্থক হবে। এর জন্য দরকার সকলের নিরলস পরিশ্রম ও দেশের প্রতি ভালোবাসা।

মো. ইলিয়াজ হোসেন (রানা): প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ইস্পাহানী সরকারি কলেজ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বাংলা সাহিত্যে হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২ খ্রি.) একটি নাম, একটি ইতিহাস। তিনি ছিলেন সাহিত্যচর্চা নামক শিল্পের সুনিপুণ কারিগর। যদিও তিনি উপন্যাস লিখে সবচেয়ে বেশি যশস্বী হয়েছেন। তারপরেও শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যে শাখায়ই তিনি কলম ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে তাই-ই হীরকখণ্ডে পরিণত হয়েছে। তিনি মূলত উপন্যাসের মাধ্যমে জনপ্রিয়তার আকাশচুম্বী সফলতার পাদপীঠে পৌঁছালেও তাঁর পরিচয় কেবল ঔপন্যাসিকের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি ছিলেন সরস গল্পকার, জনপ্রিয় গীতিকার, স্বনামধন্য চিত্রনাট্যকার, প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও সুদক্ষ চলচ্চিত্র পরিচালকও বটে। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র বাংলাদেশের সুস্থধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের পথপ্রদর্শক। তিনি অল্পসংখ্যক কবিতাও লিখেছেন।

বাংলাদেশের পাঠবিমুখ জনগোষ্ঠীর মনে বইয়ের প্রতি ভালোবাসার জন্ম দিয়েছেন এই অক্লান্তকর্মী বহুমাত্রিক লেখকই। তাঁর হৃদয় ছোঁয়া, হাস্যরসাত্মক ও মনোলোভা লেখনীতে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ হয়েছে দুই বাংলার লাখো-কোটি পাঠক। তাঁর লেখনীতে ছিল জাদুর ছোঁয়া। কেননা তাঁর যে-কোনো লেখা পড়া শুরু করলে শেষ না করে পাঠক শান্তি পায় না। বিমুগ্ধ চিত্তে এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি গল্প-নাটক-উপন্যাস। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনের উপস্থাপন তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হলেও নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির জীবনাচারও রূপায়িত হয়েছে তাঁর অনেক লেখাতেই। কথার জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ যেভাবে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক তরুণ-যুবক-প্রৌঢ় পাঠকের দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছেন, এমনটি আর কোনো বাঙালি কথাসাহিত্যিকের বেলায় ঘটেনি। দুই বাংলায়ই তাঁর জনপ্রিয়তা গগন ছোঁয়া। বিশেষ করে তরুণ পাঠক-ভক্ত-অনুরাগী তাঁর সবচেয়ে বেশি। ধারণা করা হয়, শরৎ-রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের তিনিই অন্যতম জননন্দিত লেখক।

বিচিত্র সব বিষয়ে দুহাতে লিখে গেছেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর গ্রন্থসম্ভারের বহর অনেক দীর্ঘ। তাই কোনো নির্দিষ্ট ঘরানার ঔপন্যাসিক, গল্পকার বা চলচ্চিত্রকার হিসেবে তাঁকে সূচিত করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। তবে একটি বিষয়ে প্রায় সময়ই তিনি কলম ধরে আপামর বাঙালির শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন এবং চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে আসন করে নিয়েছেন। আর তাহলো মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী বাঙালি জনগোষ্ঠীর জীবনাখ্যান।

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ হলেও তিনি মুক্তিযুদ্ধকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। এসময় গ্রেপ্তার হয়ে নির্যাতিত হয়েছিলেন পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে। এমনকি তাঁকে হত্যা করার জন্য গুলিও চালানো হয়। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে। তিনি দৈবক্রমে বেঁচে যান। তবে নিজে প্রাণে বেঁচে গেলেও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতির সম্মুখীন হন তাঁর পিতাকে হারিয়ে। ১৯৭১ সালে হুমায়ূন আহমেদের পিতা ফয়জুর রহমান তৎকালীন বৃহত্তর বরিশালের পিরোজপুর মহকুমার পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলোতে তিনি এতটুকুও ভয় পাননি। একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে সদর্পে রুখে দাঁড়ান। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে হত্যা করে। ভরা পূর্ণিমার এক রাতে নদীর জলে ভেসে গিয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের পিতার লাশ। অকালে পিতা হারানো শোক তাঁর নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের মনে বিষাদের গভীর ছাপ ফেলেছিল।

তারপরেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তাঁর মতো একক কোনো কলমসৈনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল ধারায় এত বেশি সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হননি। তিনি সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের নানাদিক তাঁর উপন্যাস, নাটক, ছোটোগল্প এবং চলচ্চিত্রের পর্দায় সুনিপুণ হাতে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে। বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের লোমহর্ষক ঘটনাবলি তাঁর বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তুলে ধরে প্রাজ্ঞকথক হিসেবে যে অবদান রেখেছেন তাঁর তুলনা তিনি নিজেই।

বাংলাদেশের স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছেন মোট নয়টি উপন্যাস। এই নয়টি উপন্যাসজুড়েই ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ একাত্তরের নয় মাস যুদ্ধকালীন সময়ের পূর্ব বাংলার সমাজজীবনের বাস্তবচিত্র এমনভাবে পরিস্ফুটন ঘটিয়েছেন যে, সেখানে কেবল যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের ছবিই নয়, একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায় স্বপ্নময় ও নতুন মূল্যবোধের সাহসী ও প্রতিবাদী মানুষের প্রতিচ্ছবিও। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালি জাতিসত্তার ওপর নিপতিত মর্মযাতনা, তাদের হৃদয়ের মর্মন্তুদ হাহাকার-আর্তনাদ, অবরুদ্ধ সময়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, ভয় ও আতঙ্কের করুণ চিত্র যেমন তিনি তাঁর সুনিপুণ লেখনীর আঁচড়ে অসাধারণ শৈল্পিকরূপ দান করেছেন, তেমনি আদ্যপান্ত তুলে এনেছেন মুক্তিকামী বীর বাঙালির অসীম বীরত্বগাথার কথা। তিনি কলম ধরেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের দুঃসাহসী অভিযান ও তাঁদের

স্বদেশের প্রতি নিখাদ প্রেমের গীতি আলেখ্যর পরিস্ফুটন ঘটাতে। তার সাথে পাকিস্তানি দখলদারবাহিনী ও তাদের এদেশীয় অনুচর রাজাকার-আলবদর-আলশামস ও তথাকথিত শান্তি কমিটির দালালদের অকথ্য পৈশাচিক বর্বরতা, নারী নির্যাতন ও নারকীয় নিষ্ঠুরতার সকরুণ চিত্র বিবৃত করেছেন। আর যখনই তিনি মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছেন সেখানেই তাঁর নিজের সেই অভিজ্ঞতাগুলোর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহতি পরেই (১৯৭৪ খ্রি.) তিনি রচনা করেন *শ্যামল ছায়া* উপন্যাসটি। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন– 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আমার প্রথম লেখাটি লেখা হয় মুক্তিযুদ্ধের চার বছর পর। নাম *শ্যামল ছায়া*। একটি ছোটোগল্প যা থেকে পরে *শ্যামল ছায়া* নামে একটি উপন্যাস লিখি। মুক্তিযুদ্ধকালীন এক রাতে একদল অকুতোভয় তরুণ মুক্তিযোদ্ধার মেথিকান্দা নামক থানা আক্রমণকে কেন্দ্র করে রচিত এই উপন্যাসটি।'

এ উপন্যাসে তিনি মূলত পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী কর্তৃক বাঙালি হত্যা, নিপীড়ন, নির্যাতন ও রাজাকার-আলবদরদের উপদ্রব ও মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের তথাকথিত অপরাধে বাংলার নিরপরাধ মানুষদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দানের জন্য আশ্রয়দাতাদের নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা, ভারতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার সহজসরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কয়েকজন তরুণ গেরিলা যোদ্ধার একটি অপারেশন পরিচালনার কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে এ উপন্যাসের মূল কাহিনি। জাফর, হুমায়ূন, মজিদ, আনিস প্রমুখ মুক্তিকামী যোদ্ধাদের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন আক্রান্ত পূর্ব বাংলার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট।

একই বছর (১৯৭৪ খ্রি.) তিনি রচনা করেন *নির্বাসন* নামক আরেকটি উপন্যাস। উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক হলেও এটিকে সামাজিক জীবন ঘনিষ্ঠ উপন্যাস হিসেবেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এ উপন্যাসের ঘটনার পরম্পরায় এক বিয়োগান্তক কাহিনি বিধৃত হয়েছে। উপন্যাসটিতে যাকে কেন্দ্র করে রচিত সেই আনিস একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বেই তার নিজের চাচাতো বোন জরীর সাথে বিয়ের কথা পাকাপোক্ত হয়। বীরদর্পে যুদ্ধ করে আনিস অসম সাহসিকতার পরিচয় দেন। একদিন যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের গুলির আঘাতে আনিস পঙ্গুত্ব বরণ করেন। যুদ্ধ শেষে পঙ্গু অবস্থায় দেশে ফিরে এলেও নানা পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক কারণে জরীকে আর তার বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। ফলে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ উপহার দিলেও সংসার নামক সুখপাখি তার কপালে আর ধরা দেয়নি। জরীর বিয়ে হয়ে যায় আরেক জনের সাথে, যাকে জরী ভালোবাসে না। একটি যুদ্ধ কীভাবে প্রেম ও পূর্ণতাকে পর্যুদস্ত করে দিতে পারে, সেই করুণ চিত্রই এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এরপর ১৯৭৮ সালে রচনা করেন *সৌরভ* নামক আরেকটি উপন্যাস। পরিবার বিচ্ছিন্ন এক তরুণীর আত্মজীবন মূল উপজীব্য হলেও, হুমায়ূন আহমেদের *সৌরভ* উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত হবার চিত্র। এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সফিক নামক একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী বাড়িওয়ালা। সে শারীরিকভাবে একজন পা হারানো খোঁড়া লোক হলেও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তার সমস্ত মন-মনন পড়ে থাকে যুদ্ধের মাঠে। সশরীরে প্রত্যক্ষভাবে সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও পরোক্ষভাবে সে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চিন্তা মানসিকভাবে লালন করতেন। পুরো উপন্যাসজুড়েই লেখক মূলত মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও কলকাতা থেকে সম্প্রচারিত আকাশবাণী রেডিওর সংবাদ, স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপনাদায়ক গান-কথিকা প্রচার করে মুক্তিযুদ্ধে শব্দসৈনিকের ভূমিকা পালন, পাকিস্তানি মিলিটারিদের সাথে রাজাকার-আলবদরদের সখ্যতা, বাঙালি তরুণ-যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অংশ হিসেবে ভারতের বিভিন্ন যুদ্ধ শিবিরে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালিদের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িতে লুটপাট-অগ্নিসংযোগ, অবরুদ্ধ নগরী ঢাকায় অবস্থানরত মানুষের দুর্দশাসহ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বিপদগ্রস্ত মানুষের সার্বিক চালচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র* গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন– 'মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ১০ বছর পর লিখলাম *সৌরভ*– মুক্তিযুদ্ধের সময়কার ঢাকা নগরীর মানুষের জীবনচর্চার গল্প। আমার কাছে মনে হলো অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর কিছুটা চিত্র *সৌরভে* ধরা পড়েছে।'

১৯৭১ উপন্যাসটি অনেকটা হুমায়ূন আহমেদের 'উনিশ'শ একাত্তর' গল্পেরই সম্প্রসারিত রূপ। তবে এই উপন্যাসের কাহিনি আরও বেশি বিস্তৃত এবং যুদ্ধকালীন সময় ও সমাজবাস্তবতার সত্য-স্বরূপ উন্মোচনের প্রশ্নে তাঁর এ উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে একটি সফল শিল্পকর্ম। এ উপন্যাসে গল্পের চেয়ে আরও অনেক বেশি চরিত্রের সমাগম ঘটেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে জয়নাল মিয়া, স্থানীয় মসজিদের ইমাম এবং স্কুল-শিক্ষক আজিজ মাস্টার, বৃদ্ধ মীর আলী ও তার ছেলে বদিউজ্জামান নামক এক তরুণের জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুমায়ূন আহমেদ ১৯৭১ উপন্যাসটি রচনা করেন। রফিক নামক এক রাজাকারের সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী কর্তৃক হিন্দুদের ওপর নির্মম হত্যা-নির্যাতন, জঙ্গলে আত্মগোপনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের সবার অলক্ষে খাবার সরবরাহ করছে কৈবর্তরা– এই অজুহাতে জেলে পল্লি জ্বালিয়ে দেওয়া, মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান জানার জন্য গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদের নামে অত্যাচার-নির্যাতন ইত্যাদি বিষয় সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন এ উপন্যাসে। তবে রফিক নামক চরিত্রটি এ উপন্যাসে একটি আলো ঝলমলে চরিত্র। কেননা সে তার ভুল বুঝতে পেরে মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে পাকিস্তানি সেনাদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি একজন প্রতিবাদী মুখ। উপন্যাসের কাহিনির শেষ পর্যায়ে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে রফিক একদিন পাকিস্তানি মেজরের মুখোমুখি হয়, যা মেজরের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়। তারপরেও রফিককে পাকিস্তানি সেনাদের

হাতেই প্রাণ হারাতে হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে রূপকভাবে হলেও পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে বাঙালির বীরত্বপূর্ণ অবস্থানের চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে।

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত *আগুনের পরশমণি* উপন্যাসটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে ক'টি উল্লেখযোগ্য ও কিংবদন্তিতুল্য উপন্যাস রচিত হয়েছে, *আগুনের পরশমণি* সেগুলোর অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধে এদেশের আপামর জনগণের অসামান্য ত্যাগ ও অপরিমেয় কষ্ট-সহিষ্ণু সহ্য করার মানসিকতা অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এ উপন্যাসে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর সামগ্রিক দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে *আগুনের পরশমণি* উপন্যাসে। এ উপন্যাসের একভাগে রয়েছে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের অসহায় নরনারী, মতিন মাস্টার, অপালা, রাত্রি, সুরমা, ইয়াদ সাহেব, নাসিমা, ফারুক চৌধুরী ও আশফাক, যারা শহর ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যায়নি কিংবা যাওয়ার সুযোগ মেলেনি অথচ এদের জীবন শিশুর মতো সারল্যে ভরা। সততা ও স্বদেশপ্রেমে প্রোজ্জ্বল এই চরিত্রগুলো। অপরভাগে রয়েছে বদিউল আলম, নূরু, রহমান, সাদেক, নাজমুল ও গৌরাঙ্গ– যারা স্বদেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ওপার থেকে অস্ত্র চালনার ট্রেনিং নিয়ে সম্প্রতি ঢাকা শহরে প্রবেশ করেছে। এসব নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিকরা উপন্যাসের আখ্যানকে করেছে প্রাণস্পন্দিত আর এদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ ও নির্ভীক বীরত্বগাথার মহিমা নিয়ে এ উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অত্যোজ্জ্বল।

উপন্যাসটির প্রধান দুই চরিত্র মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতা মতিন মাস্টার ও গেরিলাযোদ্ধা বদিউল আলমের অসম সাহসিকতার পরিচয় মেলে। স্ত্রীর মতামতকে অগ্রাহ্য করে মতিন মাস্টার কর্তৃক গেরিলাযোদ্ধা বদিউল আলমকে আশ্রয়দান এবং সীমিত সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র ও যুদ্ধরসদ দিয়ে তরুণ যোদ্ধা বদিউল আলমের নের্তৃত্বে ঢাকা অঞ্চলে গেরিলা হামলা পরিচালনার নির্ভীক সাহসিকতার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ভাষায় রূপায়িত হয়েছে এই উপন্যাসে।

১৯৮৬ সালেই হুমায়ূন আহমেদের *সূর্যের দিন* নামক আরেকটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এটি মূলত একটি কিশোর উপন্যাস হলেও এই উপন্যাসে সীমিত পরিসরে চিত্রায়িত হয়েছে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের হত্যা-নির্যাতনসহ দম বন্ধ করা অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর দুর্দশা, সেখানকার জনজীবনে চাপা আতঙ্ক ও অস্থিরতা, গণহত্যা, গুম, অপহরণ, পাকিস্তানি হানাদারদের হামলায় লণ্ডভণ্ড ঢাকা নগরী ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে অসংখ্য বিপদাপন্ন নারী-পুরুষ, আবালবৃদ্ধের বিরতিহীন ছুটে চলা। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুন্দরভাবে উচ্চকিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে দেশে গোলোযোগ ও অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। লেখক তখনকার উত্তাল দিনগুলোর অনুপম চিত্র তুলে ধরেছেন *সূর্যের দিন* উপন্যাসে।

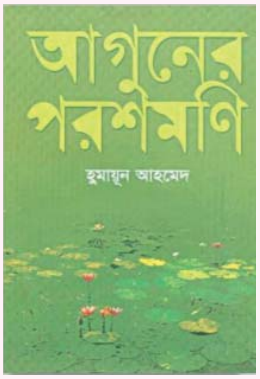

এ উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন কয়েকজন কিশোরকে, যারা 'ভয়াল ছয়' নামক একটি দল তৈরি করে এবং তাদের ইচ্ছে ছিল আফ্রিকার জঙ্গলে যাবে দুঃসাহসিক অভিযানে। কিন্তু এমন সময়ই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এসে উলটপালট করে দেয় কিশোরদের চিন্তা-চেতনা ও পরিকল্পনা। তারা সদর্পে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিকই তবে তা আফ্রিকার ঘন জঙ্গলের পরিবর্তে পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর ওপর। অকুতোভয় এই কিশোর মুক্তিযোদ্ধারা আর কখনও ঘরে ফিরতে পারেনি। কিশোর দলটির দেশের মুক্তির জন্য লড়ার যে আকুতি তা সুচারুভাবে বিধৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। তাদের স্বপ্ন-সাধনা ছিল তিমির কাটিয়ে তারা রোদ্রোজ্জ্বল একটি সূর্যের দিন ছিনিয়ে আনবে।

১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় *অনিল বাগচীর একদিন* উপন্যাসটি। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হিন্দু যুবক অনিল বাগচী একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের সন্তান। পিতার আদর্শ ও প্রচেষ্টা অনিলকে একজন সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে সে প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত, নিরাপত্তাহীন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ঢাকার একটি মেসে অবস্থান করছিল। জীবিকার তাগিদে দেশের এমন উত্তাল সময়েও তাকে নিয়মিত অবাঙালি বিহারির মালিকানাধীন অফিসে যেতে হচ্ছিল। অনিল ছোটো থেকেই খুব ভীতু প্রকৃতির লোক ছিল। অথচ সেই অনিলের মধ্যেই আমূল পরিবর্তন ঘটে মেসের এক প্রতিবেশী গফুর সাহেবের কাছে হঠাৎ একটি খোলা চিঠি আসার পর। সেই চিঠিতে অনিলের জন্য অপেক্ষা করছিল হানাদারদের হাতে নির্মমভাবে তার পিতা নিহত হওয়ার ভয়াবহ দুঃসংবাদ। সেই দুঃসংবাদ শোনার পর আকস্মিকভাবেই দুঃসাহসী হয়ে ওঠে সে। এভাবেই টান টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি গড়াতে থাকে এবং সবশেষে যুবক অনিল বাগচীর আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তার অসম সাহসিকতার পরিচয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস *জোছনা ও জননীর গল্প*। এটি তাঁর সবচেয়ে আলোচিত সৃষ্টিকর্ম। সামগ্রিক আঙ্গিকে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার স্বপ্ন দীর্ঘদিন যাবৎ মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ; যেটি হবে তাঁর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। পরবর্তীতে সেই স্বপ্নেরই বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ছিল তাঁর অনন্য সৃষ্টি *জোছনা ও জননীর গল্প*। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারান হুমায়ূন আহমেদের পুলিশ অফিসার পিতা। পরিবারের বড়ো সন্তান হওয়ায় তখন তিনি অকালে পিতাকে হারিয়ে মাসহ ছোটো ছোটো ভাইবোনদের নিয়ে অবর্ণনীয় দুর্দশায় পতিত হয়েছিলেন। সেই কষ্টবিধুর দিনগুলোর স্মৃতি মন্থন করে তিনি রচনা করেন *জোছনা ও জননীর গল্প*। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র গৌরাঙ্গের পরিবারের সবাইকে পাকিস্তানি হানাদাররা নৃশংসভাবে হত্যা করা ছাড়াও একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাস অন্যায়ভাবে তারা নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে জুলুম-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তার বিশদ বর্ণনা বিবৃত হয়েছে বাস্তবধর্মী কাহিনির এই উপন্যাসে।

ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর বছর (২০১২ সালে) প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত শেষ উপন্যাস *দেয়াল*। এ উপন্যাসটি স্বাধীনতাত্তোরকালের পটভূমিতে রচিত। বিশেষ করে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবার নিহত হলে তৎকালীন শ্বাসরুদ্ধকর সামরিক শাসনামলেও গৃহশিক্ষক শফিকের তুমুল প্রতিবাদী রূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে *শ্যামল ছায়া* ও *আগুনের পরশমণি* নিয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি নিজে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। *অনিল বাগচীর একদিন* নিয়েও চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, কিন্তু সেটির নির্মাতা ছিলেন আরেক প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম।

লেখক হুমায়ূন আহমেদ যদিও সকল শ্রেণির পাঠকের হৃদয় ছুঁতে পেরেছিলেন তাঁর লেখা উপন্যাসের মাধ্যমে, তবে মজার ব্যাপার হলো, হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যকর্মকে যারা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন, তাদের কাছে কিন্তু তাঁর উপন্যাসের চেয়ে ছোটোগল্পগুলোই প্রশংসিত হয়েছে বেশি। খুবই ছোট্ট পরিসরে খুব ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়বস্তুকে যেভাবে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। অনেক সাহিত্য সমজদারই হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের কালজয়ী গল্পগুলোর সাথে তুলনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, সাহিত্য মূল্যের দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্প সকল ক্যাটাগরিতে বিশ্ব-সাহিত্যের কালোত্তীর্ণ গল্পগুলোর থেকে কোনো দিক দিয়েই কম নয়। তিনি তাঁর গল্পে ব্যক্তিজীবনের অম্লমধুর অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের জীবন যন্ত্রণার অন্তরঙ্গ রূপটিকে সহজসরল বর্ণনার মাধ্যমে তুলে এনেছেন আপন মহিমায়। খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এক বিপুল জীবনসত্যের ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করেছে তাঁর গল্পে। মানুষের ক্ষুদ্র চাওয়াপাওয়া, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিষাদই তাঁর গল্পের উপজীব্য বিষয়।

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছোটোগল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– 'জলিল সাহেবের পিটিশন', 'নন্দিনী', 'জনক', 'শীত', 'উনিশ'শ একাত্তর' ও 'পাপ'। এসব গল্পের প্রতিটিই একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের ও ভিন্ন আবহ নিয়ে রচিত। এসব গল্পে তিনি মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নানান মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলোর অবতারণা করেন।

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রথম ছোটোগল্প 'জলিল সাহেবের পিটিশন' ছেলেহারা এক পিতার প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞার গল্প। এ গল্পে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উত্থাপন করেন জলিল সাহেব নামক এক অসাধারণ চরিত্রের মাধ্যমে। জলিল সাহেব মুক্তিযুদ্ধে তার দুই সন্তানকে হারান এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশে সহজসরল, নিরপরাধ বাঙালিদের হত্যা-নির্যাতন করা রাজাকার-আলবদরদের অবাধে দেশময় ঘুরে বেড়াতে দেখে তাদের বিচারের দাবিতে গণস্বাক্ষর গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে তিনি পিটিশনের ফাইল-পত্তর হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান।

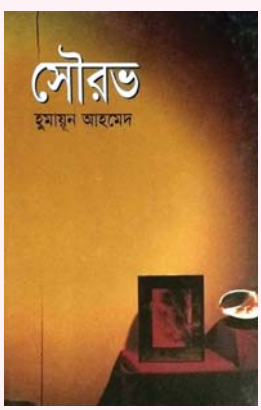

'নন্দিনী' হুমায়ূন আহমেদের অন্যতম একটি ছোটোগল্প। এ গল্পে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন বিমূর্তরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র নন্দিনী নামক এক ভাগ্যহতা হিন্দু রমণী। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার পিতাকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী। অসহায় এই নারী পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে এক রাজাকারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তার কিছুদিন পর তারও মৃত্যু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে।

'জনক' হুমায়ূন আহমেদের রচিত আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছোটোগল্প। এ গল্পের প্রধান চরিত্র মুক্তিযোদ্ধা মতি, যিনি যুদ্ধ শেষে বিজয়ের উল্লাসে ফিরে আসেন নিজ গ্রামে। এক রাতে তার দুই মাস এগারো দিন বয়সি শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে শোনায় মুক্তিযুদ্ধের দুর্ধর্ষ অভিযান পরিচালনার লোমহর্ষক কাহিনি। অবুঝ শিশুপুত্রকে সে তার সহযোদ্ধা অসম সাহসী মনু ভাইয়ের বীরত্বের কথাও শোনায়। সেই বীর মুক্তিযোদ্ধার নামানুসারে সে নিজের নবজাতক পুত্রের নামও রেখে দেন মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

'শীত' গল্পটিতেও একটি মর্মন্তুদ, বেদনাস্পর্শিত, মানবিক আবেদনসম্পন্ন জীবনালেখ্য বিধৃত হয়েছে। এ গল্পে মেছের আলি নামক এক শহিদ মুক্তিযোদ্ধার পিতার বেদনাহত হৃদয়ের কথা নিদারুণ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। শীতের হিমঠান্ডা রাতে শীতকাতর সেই পিতা যুদ্ধে শহিদ হওয়া পুত্রের নামের সুবাদে একটি কম্বল প্রত্যাশা করেন। কম্বল পাওয়ার পর সেটিকে এক বিশাল অর্জন মনে করেন তিনি এবং জীবন দিয়ে তার কম্বলপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন বলে ছেলের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। একটা সময় পর্যন্ত এদেশে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার সমাজে কী চরম অবহেলিত অবস্থায় জীবনযাপন করেছে তার বাস্তবচিত্র এই গল্পে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 'শীত' গল্পে আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মনে করিয়ে দেয় মুক্তিযোদ্ধা ছেলেকে হারিয়ে অসহায় বাবার আজন্ম দুঃখ-কষ্টের অসহনীয় দিনরাত্রিগুলো কাটে যেভাবে।

'উনিশ'শ একাত্তর' গল্পটিতে গল্পকার হুমায়ূন আহমেদ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পাকিস্তানিদের কাপুরুষতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। পাকিস্তানি এক মেজরের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনী একটি প্রত্যন্ত গ্রামে হামলার শুরুতেই খুব চোটপাট দেখাতে শুরু করে। সে গ্রামের আজিজ মাস্টার নামে একজন ভদ্রলোক তাদের কাছে গেলে পাকিস্তানি মেজর খুব চড়াও হয়ে যায় তার ওপর। তাকে অপমান-অপদস্থ করার একপর্যায়ে তাকে বিবস্ত্র হতেও বাধ্য করে। শেষটায় একপর্যায়ে সেই আজিজ মাস্টারই মৃত্যুভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে দুঃসাহসী হয়ে যায় এবং ঘৃণাভরে মেজরের গায়ে থুতু নিক্ষেপ করে। এতে মেজর নিজেই শঙ্কিত ও হতবিহ্বল হয়ে তৎক্ষণাৎ সদলবলে সেই গ্রাম ত্যাগ করে।

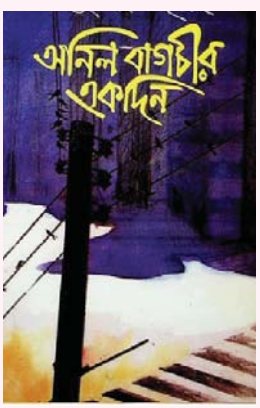

হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত আরেকটি অন্যতম গল্প 'পাপ'। এ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতার করুণ চিত্রের বাস্তব রূপদান করা হয়েছে। এ গল্পে সহজসরল ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিপদসঙ্কুল পরিবেশে কীভাবে মানুষ আত্মরক্ষার জন্য সাময়িক সময়ের জন্য বিবেকশূন্য

হয়ে কাজটি নিশ্চিত পাপ জেনেও তা করতে বাধ্য হয়।

হুমায়ূন আহমেদ নিজেকে শুধু লেখক হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। কিন্তু সাহিত্যের বাইরে গীতিকার, নাট্যকার, নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও তিনি সর্বমহলে সমানভাবে সমাদৃত। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়টি মাসই তিনি মৃত্যুকে এত কাছ থেকে দেখেছেন, অবিরত ভয় ও আতঙ্কের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে, পরবর্তী সময়ে বার বার তাঁর সৃষ্টিকর্মে ঘুরে ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ। তিনি মুক্তিযুদ্ধকে নিজের কল্পনার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন একদমই সহজসরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়। মুক্তিযুদ্ধের টিভি নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তিনি।

সেই সময়কার বাংলাদেশের একমাত্র টিভি চ্যানেল বিটিভি'র ধারাবাহিক নাটক *বহুব্রীহি*তে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত শিল্পসম্মত উপায়ে উপস্থাপন করে টিভি নাটক পরিচালনায়ও তিনি মুনশিয়ানার পরিচয় দেন। দর্শক নন্দিত নাটকটিতে টিয়া পাখির মুখে 'তুই রাজাকার' সংলাপটি ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে সেসময়। নাতিদীর্ঘ ধারাবাহিকটির শেষ অংশে দেখা যায় নীতিবান সোবহান সাহেব তার শেষ জীবনে এসে তার জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে একটি বিষয় নির্ধারণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের নামের তালিকা প্রস্তুতের কাজে মনোনিবেশ করেন। এর মাধ্যমে নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের একটি তালিকা প্রণয়ন যে জরুরি সেই দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হন।

চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্রকার হুমায়ূন আহমেদ ১৯৯৪ সালে প্রথম *আগুনের পরশমণি* নামক যে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন সেটিও ছিল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকা শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে ঘিরে গড়ে ওঠে চলচ্চিত্রটির কাহিনি। মতিন সাহেব ঢাকা শহরের সাধারণ একজন মধ্যবিত্ত নাগরিক। দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সুখের সংসার। মতিন সাহেবের বন্ধুর ছেলে এক মুক্তিযোদ্ধা এই পরিবারে আশ্রয় নেয়। তাকে ঘিরে গল্পের কাহিনি এগিয়ে যায়। একজন চিত্রপরিচালক হুমায়ূন আহমেদ এ চলচ্চিত্রটি নির্মাণে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন ক্যামেরার পেছনে থেকেও। তিনি একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সংগঠিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নারীদের ওপর জুলুম-নির্যাতন, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে ঘৃণা ও ক্ষোভের সঞ্চার, পাকিস্তানিদের এদেশীয় দোসর-রাজাকার-আলবদরদের ন্যক্কারজনক ঘৃণিত কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়গুলো খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। এ চলচ্চিত্রের জন্য হুমায়ূন আহমেদ সেরা কাহিনিকার, সেরা সংলাপ রচয়িতা, সেরা পরিচালক এবং সেরা প্রযোজক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

হুমায়ূন আহমেদ ২০০৪ সালে *শ্যামল ছায়া* নামক আরেকটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। চলচ্চিত্রটির শুরুতেই আষাঢ়ের ভরা বাদল দিনে একটি বড়ো নৌকা করে একদল নির্যাতিত আশ্রয়হীন মানুষ জীবন বাঁচানোর তাগিদে মুক্তাঞ্চলের দিকে যাত্রা করে, তাদের মাঝে ঔপন্যাসিক তুলে এনেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময়টায় প্রচণ্ড ভয় আর আতঙ্ককে। পথিমধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বাধাবিপত্তি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ পেরিয়ে নৌকার এই শরণার্থী যাত্রীদলটি শেষ পর্যন্ত শত্রুমুক্ত অঞ্চলে পৌঁছায় এবং সোল্লাসে উড়ায় বাংলাদেশের পতাকা। যাত্রাপথের খণ্ড ঘটনার ছোটো ছোটো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রকার পল্লিগাঁয়ের মানুষের অসম বীরত্ব ও ব্যক্তিভেদে অসহায়ত্ব এবং হানাদারদের অকথ্য নির্যাতন ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের চিত্রের সন্নিবেশ ঘটান। এ নৌকাটিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আসা বিপদাপন্ন লোকেরা সহযাত্রী হয়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়কার বাঙালি জাতিসত্তার অভিন্ন স্বার্থ ও আবেগ-অনুভূতিকেই এই চলচ্চিত্রে সুনিপুণ দক্ষতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ চলচ্চিত্রটি অস্কার পুরস্কারের জন্য সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র শাখায় বাংলাদেশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত হয়।

হুমায়ূন আহমেদের লেখা দুটো উপন্যাস থেকেই উল্লিখিত দুটো চলচ্চিত্রই নির্মিত হয়। তিনি খুব সহজ-স্বাভাবিক সংলাপ ও দৃশ্যায়নের মধ্য দিয়ে দর্শকের মনের গহীনে ঢুকে যেতে পারতেন। লেখক হিসেবে তিনি যেমন যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন ঠিক তেমনি চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

একথা সর্বজনবিদিত যে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হুমায়ূন আহমেদের মতো একক কোনো শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যস্রষ্টা মেধার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হননি। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামকে উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক এবং চলচ্চিত্রের শ্বেতদর্পণে প্রতিস্থাপনে তিনি যে কৌশলী অভিনবত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকর্মে বিষয়-বৈচিত্র্য, স্বাদ ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় তিনি যে নিষ্ঠাবান শিল্পস্রষ্টার পরিচয় দেন তা তুলনাহীন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর নিরলস পরিশ্রমে সিক্ত অবদান বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী যুগ যুগান্তরে স্মরণ রাখবে।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর, dr.alim1978@gmail.com

বাংলা সাহিত্য ও হেমন্ত ঋতু

জায়েদুল আলম

ঋতুচক্রের পরিক্রমায় শরতের পরে শূন্যতা, রিক্ততা ও বিষণ্ন প্রকৃতির মেদুরতাহীনতায় আবির্ভূত হয় হেমন্ত ঋতু। শরৎ প্রকৃতির বহু বর্ণিল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতার আবেশ মানবমনে শিহরণ তোলে না, শিহরণ তোলে হিমসমীরণে অদূরবর্তী তুষারের আগমনি বার্তা।

হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে ব্যাপ্ত চরাচরে বিস্তীর্ণ নয়নসম্মুখে কেবলই বৈরাগ্যের বিষণ্ণতা, হতাশা ও রিক্ততার অশুভ ধ্বনি। কিন্তু পক্ষকাল অন্তে হেমন্তে লক্ষ্মীর শুভাশিসে রাশি রাশি ভারা ভারা কনক আভাময় পাকা ধান মাঠে মাঠে শোভা পেতে থাকে। রৌদ্রখর তপ্তদাহ উপেক্ষা করে যে কৃষক ফলিয়েছে সোনা ধান, ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে তার অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসে প্রাপ্তির নির্মল হাসি। প্রকৃতির এই যে কল্যাণময়ী রূপশ্রী, অকাতরে অন্নের সংস্থান আমাদের প্রাচুর্যময়ী হেমন্ত ঋতুর অকৃপণ করুণারই নামান্তর।

সাহিত্যে ষড়ঋতুর প্রভাব সংবেদনশীল কবিচিত্তের সন্নিধানে কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রকাশ চিত্রে উপস্থাপিত হয়েছে বহুকাল থেকেই। কবিচিত্রের রূপ-রসে ঋতুচক্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বাঙ্ময় হয়ে উঠে এসেছে তাঁদের শিল্প-সাহিত্যে। প্রকৃতি একটি বড়ো অনুষঙ্গ এবং কাব্য সমৃদ্ধির এক সোনালি উদ্ভাসও বটে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতের প্রভাব দীর্ঘ হলেও হেমন্তের প্রভাব একেবারেই কম নয়। হেমন্ত প্রথমত ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি, নির্মল পরিতৃপ্তি ও আসন্ন শীত ঋতুর আগমনি বার্তাবহ এবং দিনান্তে তৃণলতার নিটোল নিশার শিশির।

বাংলা সাহিত্যে হেমন্ত ঋতু স্বল্প স্থায়িত্ব হলেও একেবারে তার প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক তাঁদের সুনিপুণ হাতের জাদু স্পর্শে শৈল্পিক সৌকর্যে হেমন্ত অনবদ্য বাণীমূর্তি রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। সাহিত্যের প্রাচীন যুগে বৌদ্ধ সহজিয়াগণ রচিত চর্যাপদে কোনো ঋতুরই উপস্থিতি নেই। তবে মধ্যযুগের কবি কংকন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত *কালকেতু* উপাখ্যানে হেমন্তের সামান্য নমুনা পরিদৃষ্ট হয়।

কবির ভাষায়:

কার্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশ
যগজনে করে শীত নিবারণ বাস।

মধ্যযুগের *বৈষ্ণব পদাবলিতে* হেমন্তের নতুন ধান্যে কৃষকের ঘরে ঘরে সুখের আবেশ ছড়ায়। এ সময়ে তারা পরম তৃপ্তিতে সুখস্মৃতি নিয়ে আনন্দ বিলাসে মেতে ওঠে। বৈষ্ণব পদকর্তা লোচনদাসের পদে তার সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে। যেমন–

অঘ্রানে নোতুন ধান্য বিলাসে।
সর্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে ॥
পাটনেত ফোটে ভোটে শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদ তলে ॥

বৈষ্ণব পদকর্তাগণের মধ্যে গোবিন্দদাস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর রচিত পদে তৎকালীন গ্রামীণ সমাজ জীবনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। অঘ্রানে ভরা ফসলের সময় সুখ-সমৃদ্ধির কারণে কৃষান-কৃষানি কুলবধূরা স্বামীগৃহ থেকে পিতৃগৃহে নায়রে গমন করে। কবির কবিতায় তার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে।

আঘান মাস রাস রস সায়র
নায়র মাথুরা গেল।
পুর রঙ্গিনীগণ পুরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল ॥

বাংলাদেশ গ্রামভিত্তিক কৃষিপ্রধান দেশ। তাই কৃষক, কৃষিপণ্য, কৃষকের জীবনাচরণ আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি বড়ো অনুষঙ্গ। সে কারণে এ দেশের প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকের রচনায় কোনো না কোনোভাবে হেমন্ত ঋতুর প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হেমন্ত ঋতু নিয়ে অজস্র কবিতা ও গান রচনা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অনীক মাহমুদ প্রমুখের কবিতা অসাধারণ জনপ্রিয়।

নিসর্গ প্রকৃতি, ঋতুচক্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মদর্শন ও ভাববাদী চিন্তা-চেতনায় অন্তর্লোকে পরমাত্মার স্পর্শে মূর্ত হয়ে উঠেছে নিরালোকের ভাব ও ব্যঞ্জনাময় উপস্থিতিতে। তাঁর অসংখ্য গান ও কবিতায় হৈমন্তিক বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। তাঁর কাছে হেমন্ত নিঃশব্দ গতিহীন স্তব্ধতা এবং অবারিত শান্তির প্রতীক। কবিতায় তার প্রকাশ–

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে
জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়ে শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি।
(নৈবেদ্য)

কবিগুরুর অসংখ্য কবিতা ও গানে হেমন্ত ঋতুর প্রসঙ্গে এসেছে বহুবার।

'হেমন্তে কোন বসন্তেরই রাণী পূর্ণশশী ওই যে দিলো আনি/ বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়' আবার 'হিমের

রাতে ওই গগনের দীপ গুলিরে। হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।' কবির লেখা এসব গানে প্রকৃতি পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় হেমন্তের মেঘমুক্ত গগনে পূর্ণশশীর আলোকছটায় কীভাবে বিশ্বময় উদ্ভাসিত করে তার চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় প্রকৃতি হেমন্ত শিশিরভেজা হিমেল হাওয়ার শিশির অনুভূতি এবং তীর্যক কাঁচা রোদের উষ্ণ পরশ।

হেমন্তের ঐ শিশির নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠল মেতে।
টইটুম্বুর ঝিলের জলে
ফাঁটা রোদের মানিক জ্বলে
চন্দ্র ঘুমায় গগন তলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে।

তাঁর 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতায় হেমন্তের আবির্ভাব ঘটে ধরণিতে আশীর্বাদের বার্তা নিয়ে। এ সময়ে গ্রামবাংলা নতুন ধানের নবান্ন উৎসবে মেতে ওঠে। বাড়িতে বাড়িতে চলে ফিরনি, পায়েস ও পিঠা তৈরির ধুম।

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণির সওগাত?
নবীন ধানের আঘ্রানে আজি অঘ্রান হল মাৎ।
গিন্নি পাগল চালের ফিরনি
তশতরী ভরে নবীনা গিন্নী
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশিতে কাঁপিছে হাত।
শিরনি রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেসমাত।

হেমন্ত প্রকৃতিতে গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের কবিতায়। তাঁর কবিতার বর্ণনায়–

আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল ক্ষেতের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাহিতেছে কে যেন হলদি কোটার গান।
ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমীলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায়।
(সুখের বাসর, *নকশিকাঁথার মাঠ*)

বাংলার প্রকৃতিতে প্রাচুর্যময়ী হেমন্ত যেন কল্যাণময়ী নারীর অকৃত্রিম শুভশ্রীর নিরাভরণ উপস্থিতি; আত্মমগ্ন কবি চিত্তের অনুধ্যানের অনুষঙ্গ। হেমন্তের রূপলাবণ্যে নিমগ্ন কবি জীবনানন্দ দাশের অজস্র কবিতায় ধূমল কুয়াশাচ্ছন্ন হেমন্ত প্রকৃতি অন্তরঙ্গ অনুভবের সংশ্লিষ্টতায় অপূর্ব বাণীমূর্তি রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। হেমন্ত তাঁর প্রিয় ঋতু। অপূর্ব কাব্যিক সুষমায় হেমন্ত তাঁর তুলির আঁচড়ে বাঙ্ময় রূপে ধরা দিয়েছে। আর কোনো কবির কাব্যে হেমন্ত তাঁর মতো রূপক, উপমা অলংকার, নব নব শব্দের বিনুনিতে এত অনবদ্য প্রকাশ চোখে পড়ে না।

তাই 'হেমন্তের কবি জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধে নরেশ গুপ্ত লিখেছেন,

> জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে অজান্তে কখন আমরা সেই রূপসী হেমন্তের প্রেমে পড়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে, কৃষির সোনার কৌটোতে আমাদের প্রাণের ভ্রমরটি যদিও ভরে রাখা আছে তাহলেও ফলন্ত ধানের ঋতু হেমন্তের গাঁথা বাংলা কবিতায় একরকম ব্যতিক্রম বললেই চলে। শুধু কি দৃশ্যের? গন্ধের, শস্যের, আলস্য পূর্ণতা-বিষাদের করুণতামাখা লাবণ্যময়ী ঋতু হেমন্ত বাংলার কাব্য বর্ষার স্তুতিতে, বসন্তের বন্দনায় মুখর এবং সে দুটি বিখ্যাত ঋতুই বিখ্যাত আরও অনেক কিছুর মতো জীবনানন্দের কবিতায় অনুপস্থিত। হেমন্তের গভীর গম্ভীর রূপ কীটস্ এরও প্রাণ ভুলিয়েছিল। শেষ পর্বে জীবনানন্দের কাব্যে যখন জনমান্তর ঘটছে, হেমন্ত তখনও তাঁর উপকরণ হয়েছিল, তার ব্যবহার যদিও তখন ভিন্ন। হেমন্ত প্রথমত শস্যের, তৃপ্তির, বিরতির ঋতু।
>
> হেমন্ত তাঁর চোখে কেবল রূপসজ্জা ও সৌন্দর্যের জৌলুস মাত্র নয়; হেমন্ত তাঁর কাছে প্রেম, বিরহ, মিলন ও সৃষ্টির এক অপার বিস্ময়। কবি হেমন্তকে ভালোবাসেন, ভালোবাসেন বিকেলের নরম হলুদ রঙের বর্ণবৈভবহীনতা এবং বিরাণ শূন্য প্রান্তরের বিবর্ণতা।

আমি এই অঘ্রানেরে ভালোবাসি বিকেলের এই রং-রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম-ঢালু মাঠ-বিবর্ণ বাদামি পাখি-হলুদ বিচালি
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে ঘাসে কুড়ানির মুখে তাই নাই কোনো কথা,
ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে জীবনেরে জেনেছে সে কুয়াশায় খালি
তাই তার ঘুম পায় ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনি সে ক্ষেতের ভিতর
এখনি সে নেই যেন ঝড় পড়ে অঘ্রানের এই শেষ বিষণ্ন সোনালি।
(অঘ্রান, জীবনানন্দের অপ্রকাশিত কবিতা)

নির্জন স্বাক্ষর, *পেঁচা*, *ধানকাটা হয়ে গেছে*, *অঘ্রান প্রান্তরে হেমন্ত রাতে*, *হেমন্তের কুয়াশায়*, *হেমন্তের নদীর পারে অঘ্রান*, *গোধূলি সন্ধির নৃত্য* প্রভৃতি কবিতায় হেমন্ত ঋতু অনবদ্য শিল্প সুষমায় জীবন চিত্রকল্পের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠে।

গ্রামবাংলার অনবদ্য রূপ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবি সুফিয়া কামাল। প্রকৃতির সহজসরল ও স্বাভাবিক রূপ তাঁর কাব্যে উপজীব্য হয়ে উঠেছে। গভীর মমতায় ও ভালোবাসায় প্রকৃতি তাঁর অন্তরঙ্গ অনুভবের সংশ্লিষ্টতায় অপূর্ব সৌন্দর্যে আবির্ভূত হয়েছে পল্লি বাংলার অপরূপ চিত্র। তাঁর কবিতার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে–

হেমন্তের কবি আমি, হিমাচ্ছন্ন ধূসর সন্ধ্যায়
গৈরিক উত্তরীয় টানি মিশাইয়া রহি কুয়াশায়।
(মন ও জীবন)

আবার কখনও তিনি হেমন্তকে চিঠি লিখে বাংলার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতিতে আবির্ভূত হওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন।

সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
কোন পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে।

হেমন্তের আগমনে শিশির সন্ধ্যায় শির শির হিমেল অনুভূতি আসন্ন শীতের বার্তা বয়ে আনে। শস্যহীন রিক্ত মাঠ, বৃক্ষ শাখা থেকে হলুদাভাব চ্যুত পত্রের স্তূপ। এ সময়ে বিরাণ মরুভূমির মতো চারদিকে নির্বাক ধ্বনি উত্থিত হতে থাকে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় প্রকৃতির এই রিক্ততা ও শূন্যতার চিত্রকল্পে হেমন্তের নীরবতার চিত্রই ফুটে ওঠে। যেমন–

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্ত লোহিত
তরুণ-তরুণী শূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ন বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত ॥
(হৈমন্তী, *অর্কেষ্টা*)

হেমন্ত ঋতু বিষণ্নতা রিক্ততা ও শূন্যতার এই বোধ আধুনিক কাব্যে পল্লবিত হয়ে শাখা মেলেছে জীবনানন্দ দাশের হেমন্ত পঙ্‌ক্তিতে। তাই বুদ্ধদেব বসুর কবিতার হেমন্ত চৈতন্যকে আনন্দে উদ্বেলিত করে না, তাঁর বিষণ্ন মনে হেমন্ত আর দোলা দিয়ে ওঠে না। কবির

কবিতায় তার প্রকাশ–

পউষে ফাল্গুন গাঁথা কান্না-হাসি দোলানো অন্যায়
আমাকে বেঁধে না আর, বড়ো জোর রাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার সংবিৎ
এঁকে যায় যায় সামান্য গণিত চিহ্নে পঞ্জিকার পালা।
(ঋতুর উত্তরে আধার আলোর আধিক্য)

পল্লি বাংলার লোকায়িত জীবন ও তার শ্যামল রূপ ঐশ্বর্য আল মাহমুদের কবিতায় ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রকৃতি কখন কখন দেহজ কামনা বাসনায় অপূর্ব নারীমূর্তি রূপে আকর্ষণ করেছে সান্নিধ্য পাওয়ার বাসনায়। তাঁর কাব্যে প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও নারী অভিন্ন সত্তায় একাকার হয়ে মিশে আছে এভাবে–

আজ এই হেমন্তের জলজ বাতাসে
আমার হৃদয় মন মানুষীর গন্ধে ভরে গেছে
রমণীর প্রেম আর লবণ সৌরভে
আমার অহংবোধ ব্যর্থ আত্মতুষ্টির ওপর
বসায় মার্চের দাগ, লাল কালো
কট ও কষায়।
(অঘ্রান)

হেমন্তের আগমনে গ্রামীণ পল্লিজীবনে কৃষান-কৃষানির মুখশ্রীতে আনন্দের ঝিলিক খেলে যায়। নতুন স্বপ্নে বিভোর এ শ্রেণির মানুষের অনাগত দিনগুলোর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের নিমিত্তে শস্যভরা হেমন্তের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। যেমন–

হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক।
তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছিল ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের
মতন
কতকালের পুরানো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
ওই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
আমি দেখেছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে
বকের মতো নিভৃতে মাছ ।
(হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান)

মাঠে মাঠে ছড়ানো সোনালি ধানের প্রাচুর্য হেমন্ত লক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন দৃষ্টির প্রকাশ হলেও মাঝে মাঝে কৃষান-কৃষানি সর্বস্বান্তও হয়ে পড়ে।

একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যায় ভেসে যায় ফসলের মাঠে আবার কখনও মহাজনী শোষণে নিঃস্ব হতে থাকে কৃষকের জীবন স্বপ্ন ও সম্ভাবনা। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে কৃষকের জীবন, অনিকেত দুঃসহ বেদনা ভার তাদের দিশেহারা করে তোলে। কবি অনীক মাহমুদের কবিতায় কৃষকের সে চিত্র ফুটে উঠেছে এভাবে–

আবার ফেরাও চোখ মুখ্যুসুখ্যু জনপদ বস্তির উঠোনে,
হেমন্তের রুপোলি শিশির এসে ধুয়ে গেছে পা ঘাসের গালিচা–
এখানে পড়েনি তবু লক্ষ্মীর করুণা, দ্রৌপদীর পদপাত,
জলমগ্ন ধানক্ষেতে বন্যার অশনি থাবা শেষ হয়ে গেছে,
খুশির চিবুক ছুঁয়ে এখনো আসেনি কোনো আগন্তুক
নবান্নের কাকভোরে উপদ্রুত হাতে শূন্য পাত্র কাঁপে...
খরাদগ্ধ ফসলের ঘ্রাণ উঠে গেছে মহাজনী মজুত খানায়।
(হেমন্তের প্রতি একলব্যের ভবিতব্য)

সুতরাং হেমন্ত প্রকৃতির বৈচিত্র্যে এদেশের অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক বিস্তর মুগ্ধচিত্ত না হলেও অনেকেই এ প্রকৃতি নিয়ে কবিতা রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। সৃজনশীল কবি হৃদয় এ বিষণ্ন, উদাসীন প্রকৃতিকে স্নিগ্ধ মধুর কাব্যিক উপমায় হেমন্তকে তুলে ধরেছেন মমতাময়ী নারীর সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতাকে। হেমন্ত লক্ষ্মী এ সময় ধরাধামে তার প্রসন্ন দৃষ্টির মায়ায় কৃষকের গোলা ভরে দেয় পরদুঃখ হরণেচ্ছায় শান্তির পরশে। আধুনিককালের প্রায় সকল কবিরই রচনাতে কোনো না কোনোভাবে হেমন্ত ঋতুর প্রসঙ্গ বিদ্যমান রয়েছে।

অতএব, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও অলংকারে হেমন্ত ঋতু কবি হৃদয়ের সংশ্লিষ্টতায় অনবদ্য ও নান্দনিকতায় বাংলা সাহিত্যে অনন্য।

জায়েদুল আলম: গবেষক, লেখক ও শিক্ষাবিদ, zaidulalam@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হয় ৩রা অক্টোবর। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী প্রদান করেন। বাণীতে তিনি বলেন, করোনা মহামারির মধ্যেও কৃষি খাত নিরবচ্ছিন্নভাবে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য জোগানের পাশাপাশি অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে খোরপোশের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ শীর্ষ ১০-এ স্থান করে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬ প্রদান করা হয়। বাণীতে শেখ হাসিনা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীনের পর কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি গরিব কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন এবং পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির সিলিং নির্ধারণ করেন। কৃষি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠন করেন এবং জাতীয় পর্যায়ে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' প্রবর্তন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা দেশব্যাপী ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি। এতে কৃষিনির্ভর শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে আমরা উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ অনুসরণে ফসল উৎপাদন, আধুনিক প্যাকিং হাউস নির্মাণ, অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। আমাদের সরকার 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৬' প্রবর্তনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করেছে।

কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ, সমবায়, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক চাষ, বনায়ন, গবাদি পশু পালন এবং মাছ চাষে অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬ বিতরণ করেন। নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি স্বর্ণ, ২৫টি ব্রোঞ্জ এবং ১৬টি রৌপ্য পদক বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: শুভ আহমেদ

নবান্নের বহুমাত্রিক রূপ

প্রত্যয় জসীম

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের বাংলাদেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত নিয়ে আমাদের ষড়ঋতু। ঋতু বদলের পালায় আবার আমাদের মাঝে ফিরে এল হেমন্ত ঋতু। ষড়ঋতুর মাঝে হেমন্ত আসলেই একটি চমৎকার ঋতু। কী শান্ত, কী স্নিগ্ধ, কী মধুর ঋতু। হেমন্তের যেন তুলনাই হয় না। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, বাংলা এ দুই মাসকে আমরা 'হেমন্তকাল' বলে থাকি। এক সময় বাংলার বছর শুরু হতো হেমন্ত দিয়ে। সম্রাট আকবর বাংলা পঞ্জিকা তৈরির সময় অগ্রহায়ণ মাসকেই বছরের প্রথম মাস বা খাজনা আদায়ের মাস হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। ষড়ঋতুর পালাবদলে সোনালি রঙের সৌন্দর্য নিয়ে হেমন্ত আসে আমাদের মাঝে। এসময় মাঠে মাঠে থাকে সোনালি ধান। হিম শীতল হাওয়ায় সোনালি ধানের শিষে ঢেউ খেলে আসে হেমন্ত। কিচিরমিচির পাখির ডাক, শিশিরে ভেজানো দুর্বা ঘাস, শুকিয়ে যাওয়া পথ ঘাট, ফুল সুরভি ঢেলে, পাকা ধানের মৌ মৌ ঘ্রাণ নিয়ে, মিষ্টি মিষ্টি সূর্যের হাসি ছড়িয়ে, নবান্নের আমন্ত্রণে হেমন্ত আসে সোনামাখা জাদুমাখা শিল্পীর ছবি আঁকা আমার বাংলাদেশে। কৃষক-কৃষানির মুখে অনাবিল হাসি, রাখাল রাজার মধুর বাঁশির ধ্বনিতে, মন-প্রাণ আকুলিবিকুলি করে, করে ঝংকৃত। কবি লিখেন অনুপম কবিতা, ছড়াকার লিখেন শাশ্বত ছড়া। বাউল মনে জাগে ভাব আর ছন্দ, চলেন একতারা বাজিয়ে মেঠোপথ দিয়ে, যান দূর সীমানায় মিলিয়ে। কিছুটা-লেপ কাঁথার প্রয়োজন পড়ে।

এসময় কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়ে নদনদী, গোটা গ্রামবাংলা। এককালে গ্রামবাংলায় হেমন্তই ছিল উৎসব-আনন্দের প্রধান মৌসুম। ঘরে ঘরে ফসল তোলার আনন্দ আর ধান ভানার গান ভেসে আসত বাতাসে। ঢেকির তালে মুখর হতো বাড়ির আঙিনা। নবান্ন আর পিঠে-পুলির আনন্দে মাতোয়ারা হতো সবাই। রুটি পিঠা বা রুটি শিরনির প্রচলন ছিল গ্রামবাংলায়। নতুন ধানের চালের গুড়ি দিয়ে গোলায় তোলা ধান শূন্য ক্ষেতে ন্যাড়ার আগুনে পুড়ে বিশেষ পদ্ধতিতে এই পিঠা তৈরি করা হতো। পিঠা তৈরির পর সবার মাঝে বিতরণ করা হতো শিরনি আকারে। এখনতো প্রযুক্তির কল্যাণে নানা যন্ত্রপাতির আবির্ভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে এসব। হেমন্তের প্রথম ভাগে শরতের অনেক বৈশিষ্ট্য থেকে যায়। দুই ঋতুকে আলাদা করা প্রায় কঠিন হয়ে পড়ে। এসময় আকাশ থেকে খণ্ড খণ্ড মেঘ সরে যায়। আমাদের দেশে হেমন্তের আগের ঋতু বর্ষা ঋতু আর শরৎ। হেমন্ত হিম হিম বাতাসের সাথে শীতের আগমনি বার্তা নিয়ে আসে। এই সময় প্রকৃতি সোনালি রঙে সাজে সেজন্যও এই সময়কে হেমন্তকাল বলা হয়। এই হেমন্ত ঋতুতেই ধান কাটা, মাড়াই এবং কৃষকের গোলায় ধান তোলা উপলক্ষে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। নবান্ন উৎসব মানে নতুন অন্ন বা ভাত।

নতুন ফসল ঘরে তোলা উপলক্ষে কৃষকরা এই উৎসব পালন করে থাকেন। সাধারণত নবান্ন হয় অগ্রহায়ণ মাসে। সেসময় আমন ধান কাটা হয়। এই নতুন ধানের চাল রান্না উপলক্ষে নবান্ন উৎসব হয়ে থাকে। আগের দিনে কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল কাটার

আগে বিজোড় সংখ্যক ধানের ছড়া কেটে নিয়ে ঘরের চালে বেঁধে রাখা হতো এবং পরে ক্ষেতের বাকি ধান কাটার পর চাল করে নতুন চালের পায়েস করে নবান্ন করা হতো। নবান্নে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় নৃত্য, গান, বাজনাসহ আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালিত হয়। এছাড়া লাঠিখেলা, বাউলগান, নাগরদোলা, বাঁশি, শখের চুড়ি, খৈ ও মোয়ার পসরা বসে গ্রাম্য মেলায়। এ ঋতুতে ফোটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনী, হিমঝুরি, দেবকাঞ্চন ও রাজ অশোক প্রভৃতি। হেমন্তকালে বৃক্ষরাজি থাকে সবুজে ভরা। খালবিল, নদীনালা আর বিলজুড়ে দেখা যায় সাদা-লাল শাপলা আর পদ্মফুলের মেলা আর রোদের টাওয়েলে থাকে জড়িয়ে সেগুন, দেবদারু, শিরীষের গলার ভাঁজের মায়াবী শবনম।

হেমন্তের আমেজ কিছুটা আলাদা, কারণ নলেন গুড়ের গন্ধ মাখা দুপুর হোক আর রাঢ় বাংলার গ্রামে গ্রামে গোটা কার্তিক মাসের ভোরজুড়ে 'রাই জাগো রাই' ভোরাইয়ের গান হোক, গ্রামের ঋতু সৌন্দর্যে হেমন্ত নবান্নের নতুন ধানের উপর শিশিরকণার মতো সজীব। তাই তো সেই মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবি লোচনদাস বলেন, 'অঘ্রানে নোতুন ধান্য বিলাসে।/ সর্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে ॥/পাটনেত ফোটে ভোটে শয়ন কম্বলে।/ সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদ তলে।' হ্যাঁ, হেমন্তের অঘ্রানে নতুন ধানেই নবান্ন উৎসব হবে গ্রামে গ্রামে, সে উৎসবের কী আনন্দ তা রাঢ় বাংলায় না এলে কল্পনা করাও মুশকিল। এই নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করেই বাড়ির মেয়েরা শ্বশুরঘর থেকে আবার বাপের বাড়িতে ফিরে আসে, বাড়ির উঠোন সোনালি ধানে ভরে থাকে।

রাঢ় বাংলার বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস লিখেছেন, 'অঘ্রান মাস রাস রস সায়র/নায়র মাথুরা গেল।/পুর রঙ্গিনীগণ পুরল মনোরথ/ বৃন্দাবন বন ভেল।।' তবে হেমন্ত নিয়ে আধুনিক কবিরাও পিছিয়ে নেই, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন 'নৈবেদ্য' কবিতায়– 'আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে/জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে/শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার/রয়েছে পড়িয়ে শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার /স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি।' এই শান্ত চরাচরকে দেখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন– 'হেমন্তের ঐ শিশির নাওয়া হিমেল হাওয়া/সেই নাচনে উঠল মেতে।/টইটুম্বুর ঝিলের জলে/ ফাঁটা রোদের মানিক জ্বলে/চন্দ্র ঘুমায় গগন তলে/ সাদা মেঘের আঁচল পেতে।' পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন লিখেছিলেন– 'আশ্বিন গেল কার্তিক মাসে পাকিল ক্ষেতের ধান,/সারা মাঠ ভরি গাহিছে কে যেন হলদি কোটার গান। /ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়ায় বায়ু/কলমি লতায় দোলন লেগেছে, ফুরাল ফুলের আয়ু।'

কবি সুকান্তের ভাষায় যেন– 'নতুন ফসলের সুবর্ণ যুগ আসে।' 'এই হেমন্তে কাটা হবে ধান, আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান'। নবান্নের বর্ণনা তিনি তাঁর 'এই নবান্নে' কবিতায় এভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। হেমন্ত ঋতুর দিনরাতের অবিশ্রান্ত শ্রমে কৃষকের ঘরে ওঠে সোনার ধান। বাংলার গ্রামগঞ্জ মেতে ওঠে নবান্নের উৎসবে।

কবি সুফিয়া কামাল লিখেছেন–

> সকালবেলায় শিশির ভেজা
> ঘাসের ওপর চলতে গিয়ে
> হাল্কা মধুর শীতের ছোঁয়ায়
> শরীর ওঠে শিরশিরিয়ে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'অঘ্রানের সওগাত' কবিতায় বলেন–

> ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত?
> নবীন ধানের আঘ্রানে আজি অঘ্রান হল মাৎ।
> 'গিন্নি-পাগল' চা'লের ফিরনী
> তশতরী ভ'রে নবীনা গিন্নী
> হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশীতে কাঁপিছে হাত।
> শিরনী রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেসমাত!
> মিঞা ও বিবিতে বড় ভাব আজি খামারে ধরে না ধান।
> বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!
> 'শাশবিবি' কন, 'আহা, আসে নাই
> কতদিন হল মেজলা জামাই।'
> ছোট মেয়ে কয়, 'আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান!'
> দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো বিবি লবেজান!
> হল্লা করিয়া ফিরিছে পারার দস্যি ছেলের দল!
> ময়নামতীর শাড়ী পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল!
>
> হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত!
> কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য– আলো-সরিৎ!
> দিগন্তে যেন তুর্কী-কুমারী
> কুয়াশা-নেকাব রেখেছে উতারি!
> চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ,
> নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হল হরিৎ পাতারা পীত!
> নবীনের লাল ঝান্ডা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,
> রক্ত নিশান নহে যে রে ওরা রিক্ত শাখার জয়!

এ প্রবন্ধের রচয়িতা প্রত্যয় জসীমের কবিতায় হেমন্ত বন্দনা–

> এই হেমন্তে গাভীর ওলান ভরা থাকুক দুধে
> সব দেনা-পাওনা বুঝে নেবো আসল এবং সুদে...

মাঠে মাঠে হেমন্তের বাওকুড়ানি ঘূর্ণির পলকা টানে থামে চঞ্চল কিশোরীর মতো উচ্ছল দিনের মসলিন। হেমন্তের রূপ আর ঐশ্বর্যের খ্যাতি সব ঋতুকে যায় ছাপিয়ে, আর রাঙিয়ে দেয় বাংলার মন তার বর্ণোজ্জ্বল রঙে। পথে পথে দমকা বাতাসে ভাসে হেমন্তের ধুলো। কিছু ফুলও থাকে পড়ে হেমন্তের নির্জন ব্যালকনিতে। কিছু ঝরাপাতা। কাঁঠালিচাঁপার গন্ধে যায় ডুবে সারাটা দুপুর। ঘুঘু ডাকা নিঝুম বিকেল। হেমন্তের রাতের আকাশে দেখা যায় অগণিত তারার মেলা। সেখানকার ঘন কালো আকাশ থেকে দু-একটা তারাও যায় খসে। বিস্তৃত দিগন্তের কোথাও এক বিন্দু জমাটবাঁধা মেঘেরও দেখা মেলে না। মিটিমিটি তারা জ্বলে সারারাত। সেই সাথে চাঁদের শরীর থেকেও জোছনা ঝরে পড়ে পৃথিবীজুড়ে। সত্যি কী অপরূপ হেমন্তের প্রাকৃতিক চিত্র। আমরা তাই হেমন্তের গুণগান করি তার রূপ সৌন্দর্য দেখি।

প্রত্যয় জসীম: কবি ও সব্যসাচী লেখক, সভাপতি বাংলাদেশ রাইটার্স ফাউন্ডেশন

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

শুদ্ধাচারের সকল রীতি
দেশ গড়ার মূলনীতি

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা

ইসরাত জাহান

ডেঙ্গুর প্রধান লক্ষণ জ্বর, ভাইরাসজনিত একটি রোগ। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ থাকে। শহর অঞ্চলে বেশি হয়, কারণ অপরিকল্পিত মানুষের আগমন, নগরায়ণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বজুড়ে মানুষ ও মশার চলমান ভ্রমণের ফলে ডেঙ্গু জ্বর ৩০ গুণ বেড়েছে।

ডেঙ্গুতে ৯৯ থেকে ১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠানামা করতে পারে। জ্বর টানা থাকতে পারে আবার কমবেশিও হতে পারে। অনেকের শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা, মাথায় ব্যথা, চামড়ায় রক্ত জমাট বেধে যেতে দেখা যায়। এবারের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের বমি হচ্ছে, অনেকের বমির সাথে রক্তও বের হচ্ছে। ডেঙ্গু জ্বরের অবস্থা বুঝে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়– 'এ', 'বি' ও 'সি'। বেশির ভাগেরই 'এ' ক্যাটাগরির ডেঙ্গু হয়। এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে পানি, ডাব, স্যালাইন অর্থাৎ ফ্লুইড বেশি বেশি গ্রহণ করতে হবে। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

'বি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গুতে প্রয়োজনে কিংবা রোগীর শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

তবে 'সি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গুর লক্ষণ থাকলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসা নিতে দেরি হলে শরীরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কিডনি, লিভার, হার্ট ইত্যাদি অঙ্গ ভালো রাখতে হলে ডাক্তারের পরামর্শে দ্রুত, সঠিক এবং যথাযথ চিকিৎসা নিতে হবে। আমরা ডেঙ্গু হয়েছে বুঝতে পারলে তরল খাবার খাওয়া শুরু করতে হবে, এতে বিপদের হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

ডেঙ্গু জ্বরে প্লাটিলেটের তারতম্য ঘটে থাকে। প্লাটিলেট ওঠানামার পরিমাণটা রক্তের কিছু পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়। প্লাটিলেট কমে গেলে বা শরীরে কোনো স্থান হতে রক্ত বের হলে শরীরে প্লাটিলেট সরবরাহ করা যায়, অনেকের ক্ষেত্রে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধে কোনো টিকা নেই। এ রোগ থেকে রক্ষা পেতে প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে সবার। যেসব এলাকায় মশার উপদ্রব সেখানে মশার ওষুধ ছিটাতে হবে ঘন ঘন। মশা ডিম পাড়ে এমন জায়গাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। বাড়িতে ফুলের টবে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পানি পেলেই তবে মশা ডিম পাড়ে। এভাবে বাড়িতে বাড়িতে আমরা সচেতন হলে অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ সময় ছোটো বাচ্চা আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশি খেয়াল রাখতে হবে, এরা নাজুক থাকে। শোবার সময় মশারি খাটিয়ে দিলে নিরাপদ বোধ করবে। প্রয়োজনে ফুলহাতা জামা, পায়জামা পরিধান করতে হবে। বাজারে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের 'Mosquito repellent' পাওয়া যায়, এগুলো ব্যবহার করা যায় কাপড়ের উপর এবং শরীরের অনাবৃত স্থানে।

বাড়িতে কারও ডেঙ্গু হলে তাকে যেন অন্য আর মশা কামড়াতে না পারে। যে মশা কামড়াবে সেটা ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে পরিবারের অন্যদের মাঝে বিস্তার ঘটাতে সক্ষম– এদিকে সজাগ থাকতে হবে।

ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ কমিয়ে আনার জন্য সমন্বিত এবং সম্মিলিত কার্যক্রম দরকার। আমরা যদি নিজ নিজ ঘরকে মশার উপদ্রব থেকে দূরে রাখতে পারি, সচেতনতা বাড়াতে পারি তবে ডেঙ্গু থেকে আমরা সবাই ভালো থাকতে পারব।

ইসরাত জাহান: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

পরিত্যক্ত বালতি/মগের জমা পানি

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

পূর্ণাঙ্গ এডিস মশা

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

আপন চৌধুরী

সপ্তকলার সমন্বয়ে গঠিত চলচ্চিত্রের রয়েছে আন্তর্জাতিক ভাষা। বহু বিজ্ঞানীর সাধনা ও প্রচেষ্টায় চলচ্চিত্র আবিষ্কার পূর্ণতা পায় উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে। বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় আবিষ্কারের পর পরই ১৮৯৮ সালে। সেই ইতালিতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৩২ সালে। পরবর্তীকালে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মান, ভারত, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, স্পেন, রাশিয়া, তেহরান ও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নেয় সেই ১৯৫০ দশক থেকে। পাকিস্তানের সরকারি ফিল্ম দপ্তর (ডিএফপি) নির্মিত কয়েকটি তথ্যচিত্র বিদেশে প্রদর্শিত হয়। এরপর ঢাকায় ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণের সরকারি স্টুডিও এফডিসি নির্মিত হলে এদেশে পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মাণের পথ সুগম হয়। উল্লেখ্য, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল এফডিসি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ঢাকার চলচ্চিত্রের সোনালি দিনের সূচনা হয়। ১৯৬৫ সালে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট চলচ্চিত্র উৎসবে সুভাষ দত্ত পরিচালিত *সুতরাং* (১৯৬৪) দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পায়। এটিই বিদেশি উৎসবে পুরস্কৃত এদেশের প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র

সত্তরের দশক

মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর গণহত্যার প্রামাণ্য দলিল *স্টপ জেনোসাইড* (১৯৭১) নির্মাণ করেন জহির রায়হান। দেশ-বিদেশে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম গণহত্যার চিত্র প্রচার ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য এ চলচ্চিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চিত্রায়িত। যুদ্ধের ভয়াবহতা, প্রাণ বাঁচানোর আশায় অসহায় মানুষের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণের চিত্র বাস্তব ও মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে এ ছবিতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে কাজাখিস্তানের তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে জহির রায়হানের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *স্টপ জেনোসাইড* প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়। মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত বিদেশে প্রদর্শিত প্রথম চলচ্চিত্র সুভাষ দত্তের *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী* ১৯৭২ । ১৯৭৫ সালে জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইড* (১৯৭১) দিল্লি চলচ্চিত্র উৎসবে সিডলাক পুরস্কার পায়। ১৯৭৯ সালে মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সুভাষ দত্তের *ডুমুরের ফুল* (১৯৭৮) শিশু বিভাগে বিশেষ পুরস্কার অর্জন করে। একই উৎসবে প্রদর্শিত হয় আমজাদ হোসেনের *গোলাপী এখন ট্রেনে* (১৯৭৮) ও আব্দুস সামাদের *সূর্য সংগ্রাম* (১৯৭৯)। ছবি দুটি বেসরকারিভাবে পুরস্কৃত হয়।

আশির দশক

১৯৮০ সালে পশ্চিম জার্মানির মেনহেইমে অনুষ্ঠিত ২৯তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিজয় তালিকায় বাংলাদেশের নাম যুক্ত হয়। এই উৎসবে মসিহউদ্দিন শাকের ও শেখ নিয়ামত আলী পরিচালিত *সূর্যদীঘল বাড়ি* (১৯৭৯) তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার অর্জন করে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনে। মেনহেইমের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট জুরি কমিটিও মানবিক আবেদনের জন্য ছবিটিকে পুরস্কৃত করে। একই বছর পর্তুগালের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন এটিকে পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৮১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে *সূর্যদীঘল বাড়ি* (১৯৭৯) প্রদর্শিত হয়। ১৯৮১ সালে মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে খান আতাউর রহমানের *ডানপিটে ছেলে* (১৯৮০) পুরস্কৃত হয়।

১৯৮৫ সালে নয়াদিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রফিকুল বারী চৌধুরীর *পেনশন* (১৯৮৪) ও তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলামের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *আগামী* (১৯৮৪) অংশ নেয়। এই উৎসবে *আগামী* (১৯৮৪) শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য 'রৌপ্য ময়ূর' পুরস্কার পায়। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের জন্য এটি বাংলাদেশের প্রথম পুরস্কার অর্জন। একই বছর মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *হৃদয়ে একুশ* ডিপ্লোমা ও পুরস্কার অর্জন করে।

১৯৮৬ সালে শেখ নিয়ামত আলীর *দহন* (১৯৮৫) কার্লোভেরী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়ে আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করে। একই বছর *দহন* (১৯৮৫) ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩য় বিশ্বের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়ে প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৮৬ সালে মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে দারাশিকোর *প্রেমকাহিনী* (১৯৮৫) পুরস্কৃত হয়। ১৯৮৬ সালে জার্মানির ওবার হাইজেনে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের কয়েকজন তরুণ চলচ্চিত্রকারের নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি *ঢাকার টোকাই* (১৯৮৫) পুরস্কৃত হয়। ১৯৮৬ সালে আন্তর্জাতিক কান চলচ্চিত্র উৎসবে আমজাদ হোসেনের *ভাত দে* (১৯৮৪) চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। ১৯৮৭ সালের ১ থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং ইয়ং-এ জোটনিরপেক্ষ দেশের চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ নিয়ামত আলীর *দহন* (১৯৮৫) ছবিটি কোরিয়ার ফিল্ম ওয়ার্কাস ইউনিয়নের প্রথম পুরস্কার অর্জন করলে বাংলাদেশের নাম আবারও উচ্চারিত হয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে।

স্টপ জেনোসাইড চলচ্চিত্রের দৃশ্য

নব্বই দশক

১৯৯১ সালে বাদল রহমান ও সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী পরিচালিত *প্রত্যাশা সূর্য* (১৯৯১) তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। একই বছর বাদল রহমান পরিচালিত *সেলফ পোট্রেট* (১৯৯১) মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। ১৯৯২ সালের ৮ থেকে ১৫ই অক্টোবর কাজাখিস্তানে অনুষ্ঠিত ১১তম তাসখন্দ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তথ্য বিভাগে বিটিভি ও ডিএফপি প্রযোজিত এবং মুস্তাফিজুর রহমান পরিচালিত *শঙ্খনীল কারাগার* (১৯৯২) ছবিটি প্রদর্শিত এবং প্রশংসিত হয়। এছাড়া একই বছরের সেপ্টেম্বরে পিয়ং ইয়ং-এ অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে কাজী হায়াৎয়ের *দাঙ্গা* (১৯৯১) ছবিটি প্রদর্শিত হয় এবং পুরস্কার অর্জন করে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও নির্মিত ভিডিও ছবির মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার ওয়ার্ল্ডভিউ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন (WIF)। এই সংস্থার নির্মিত ৭টি ভিডিও চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে।

একুশ শতকের প্রথম দশক

বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ ৫৫তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের *মাটির ময়না* (২০০২)। তারেক মাসুদ নির্মিত *মাটির ময়না* কান চলচ্চিত্র উৎসবের ডিরেক্টরস ফোর্ট নাইট বিভাগে উদ্‌বোধনী চলচ্চিত্রের মর্যাদা লাভ করে। এই উৎসবের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস উইকস বিভাগের ৪০টি ছবির মধ্যে *মাটির ময়না* অর্জন করে ক্রিটিকস অ্যাওয়ার্ড। *মাটির ময়না* বিদেশে পুরস্কৃত বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার। গোলাম রাব্বানী বিপ্লবের *স্বপ্নডানায়* (২০০৭) চীনের সাংহাই চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতে নেয়। ২০০৯ সালে ভারতের ভুপালে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অন ট্রাইবাল আর্ট অ্যান্ড কালচার (আইএফএফটিসি)'র সেরা ছবি হিসেবে পুরস্কার জিতে নেয় আবু সাইয়ীদ পরিচালিত *রূপান্তর* (২০০৯)। চলচ্চিত্রটি নেদারল্যাণ্ডেসের 'হুবার্ড বারস ফান্ড' অ্যাওয়ার্ড ও রটডার্ম ইন্টন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কার অর্জন করে।

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক

২০১০ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ার সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে গৌতম ঘোষ পরিচালিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র *মনের মানুষ* (২০১০)। ২০১১ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারেক মাসুদ পরিচালিত *মাটির* ময়না (২০০২) অস্ট্রেলিয়ার টিভি চ্যানেল এসবিএসে প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য, *মাটির ময়না* ৩৫টি দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। কান আন্তর্জাতিক পুরস্কারসহ মোট ২৮টি আন্তর্জাতিক পদক লাভ করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করে।

বিশ্বের প্রাচীনতম প্রামাণ্য সিনেমার উৎসব জার্মানির ডক-লাইপজিগের উদ্‌বোধনী চলচ্চিত্র হিসেবে আমন্ত্রিত হয় কামার আহমেদ সাইমন ও সারা আফরিন পরিচালিত *শুনতে কি পাও* (২০১২)। চলচ্চিত্রটি আমস্টারডামের ইউফা থেকে চিত্রনাট্য ও প্রযোজনার জন্য পুরস্কার লাভ করে। আশরাফ শিশিরের *গাড়ীওয়ালা* (২০১৫) সর্বমোট ১৮টি দেশের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্রটি দেশ-বিদেশে বেশ প্রশংসিত হয় এবং ১৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়। অমিতাভ রেজা চৌধুরীর *আয়নাবাজি* (২০১৬) যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ এশিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা ন্যারোটিভ সিনেমার পুরস্কার অর্জন করে। একই বছর চলচ্চিত্রটি কলকাতার টেলিসিনে সোসাইটির ১৬তম পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার পায়। রাশিয়ার ৩৯তম মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে কমেরসান্ত জুরি পুরস্কার পায় মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর *ডুব* (২০১৭)। ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত রাশিয়ার কাজান মুসলিম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তৌকির আহমেদের *হালদা* (২০১৭) অংশ নেয়। এর আগে তৌকির আহমেদের *অজ্ঞাতনামা* কসোভাতে পুরস্কার জিতে নেয়। ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিজন ইমতিয়াজের *মাটির প্রজার দেশে* (২০১৯) সেরা চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়। মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৪২তম আসরে সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিভাগে প্রদর্শিত হয় নির্মাতা জসিম উদ্দিনের বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র *মায়ার জঞ্জাল*। ভারতের ঝাড়খন্ড চলচ্চিত্র উৎসবের অ্যাকশন থ্রিলার ক্যাটাগরিতে সেরা পুরস্কার অর্জন করে আসাদুজ্জামানের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *জলঘড়ি*। অনার্য মুর্শিদের স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র *কাসিদা অব ঢাকা* (২০২০) প্রদর্শিত হয় দিল্লির ইন্দুস ভ্যালি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। এটি সেরা প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের পুরস্কার পায়। ৭৪তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো অফিসিয়াল সিলেকশনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়। এই উৎসবের উন সারটেইন রিগার্ড বিভাগে প্রদর্শিত হয় নির্মাতা আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের *রেহানা মরিয়ম নূর* (২০২১)। ২০২১ সালে ২৬তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'কিম জিসুক পুরস্কার'-এর জন্য মনোনীত হয় মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর *নো ল্যান্ডস ম্যান*। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মিলভ্যালি ও প্রেসকট চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে অমিতাভ রেজার *রিকশা গার্ল*। জার্মানির শ্লিঙ্গেল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ২০২১ সালে অংশ নেয় অমিতাভ রেজার *রিকশা গার্ল*। এটি উৎসবের সর্বোচ্চ পদক এসএলএম টপ অ্যাওয়ার্ড জিতে নেয়। এছাড়া এই উৎসবে প্রদর্শিত হয় মোহাম্মদ রাব্বি মৃধার *পায়ের তলায় মাটি নেই* (২০২১)। এটি আন্তর্জাতিক প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করে। আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের *লাইভ ফ্রম ঢাকা* (২০১৯) সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা নির্মাতা ও সেরা অভিনেতার পুরস্কার জয় করে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এসব চলচ্চিত্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রদর্শনের ফলে সবাই বাংলাদেশের কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। বলা হয়ে থাকে চলচ্চিত্র সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ্য, বিশ্বের প্রায় ১৮০টি দেশে প্রতিবছর প্রায় হাজারখানেক ছোটো-বড়ো চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সুস্থধারার গল্পের চলচ্চিত্র যত বেশি নির্মিত ও দেশে-বিদেশে প্রদর্শিত হবে, ততবেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে।

আপন চৌধুরী: চলচ্চিত্র গবেষক, নির্মাতা ও লেখক, aponsopno22@gmail.com

নিউমোনিয়া প্রতিরোধে করণীয়

খালিদ হোসেন

নিউমোনিয়া একটি মারাত্মক রোগ। যে-কোনো বয়সেই এ রোগ হতে পারে, তবে শিশুদের ক্ষেত্রে এ রোগ বেশি হয়। সাধারণত পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ার প্রকোপ বেশি দেখা যায়। এ রোগটি বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ১৩ শতাংশ শিশুর মৃত্যু হয় এ রোগের কারণে। প্রতিবছর পৃথিবীতে ১৪ লাখেরও বেশি শিশু মারা যায় শুধু এই নিউমোনিয়ায়, যা সম্মিলিতভাবে হাম, এইডস ও যক্ষ্মায় মৃত্যুর চেয়েও বেশি। নিউমোনিয়ায় শিশুর ফুসফুস মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হয়। শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহকে ইংরেজিতে বলা হয় respiratory tract injection। এ প্রদাহ যখন জীবাণুঘটিত হয়, তখন একে নিউমোনিয়া বলে। এ রোগে আক্রান্ত হলে শিশুদের ফুসফুসে পুঁজ ও তরলে ভরে যায়, যার কারণে তাদের শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের (পিএইচসি) সূত্রে জানা গেছে, দেশে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের মধ্যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় ২২ শতাংশ শিশুর মৃত্যু হয়। তাদের মধ্যে দুই বছর বয়সি শিশুর সংখ্যা ৯০ শতাংশ।

বাতাসের মাধ্যমেই মূলত নিউমোনিয়া ছড়ায়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির এ রোগ হয়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কোনো সুস্থ ব্যক্তি আসলে কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা কোনো জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে তার শরীরে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। এ রোগের জীবাণু সুস্থ মানুষের নাক ও মুখে থাকতে পারে, যা শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়ে এ রোগের সংক্রমণ ঘটাতে পারে। যেসব শিশুর বয়স দুই বছরের নীচে, যারা অপুষ্টিতে আক্রান্ত, বুকের দুধ পান করেনি, বিশেষ করে শালদুধ, যাদের হাম, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, বিশেষ করে নিউমোনিয়ার টিকা দেওয়া হয়নি যাদের, সেসব শিশু বদ্ধ ঘরে ও ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে থাকে যাদের সামনে ধূমপান করা হয়, এসব শিশুদের নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। গ্রামের শিশুদের চেয়ে শহরের শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয় নিউমোনিয়ায়। এর প্রধান কারণ ঘনবসতি ও বায়ুদূষণ। নির্দিষ্ট সময়ের আগে শিশুর জন্ম হওয়া, ওজন কম হওয়া অথবা অন্য কোনো শারীরিক অসুস্থতার কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে পরবর্তী জীবনে সহজেই নিউমোনিয়ায় সংক্রমিত হতে পারে।

নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণসমূহ

১. জ্বর ও শরীরে কাঁপুনি হওয়া
২. শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট
৩. বুকে ব্যথা
৪. দ্রুত নিশ্বাস (অর্থাৎ দুই মাসের কম বয়সি শিশুদের শ্বাস নেওয়ার হার মিনিটে ৬০ বারের বেশি)
৫. দুই মাস থেকে ১২ মাস বয়সি শিশুদের মিনিটে ৫০ বারের বেশি শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে
৬. ১২ মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সি শিশুরা মিনিটে ৪০ বারের বেশি শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে
৭. পাঁজরের নীচের অংশ ভেতরের দিকে ডেবে যাওয়া
৮. ক্লান্তি অনুভব করা
৯. মাথাব্যথা ও শরীরের মাংসপেশি ব্যথা
১০. খাওয়ার প্রতি অনীহা ও বমি বমিভাব
১১. শিশুর বুকের ভেতর শাঁ শাঁ শব্দ হওয়া
১২. শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়া
১৩. শিশুর খিঁচুনি হওয়া ইত্যাদি।

নিউমোনিয়ায় শিশুর মৃত্যুর হার কমানোর উপায়গুলো হলো

শিশুর যত্নের দায়িত্বে যারা আছেন প্রথমেই তাদের উচিত নিউমোনিয়ার লক্ষণগুলো এবং কাশি বা দ্রুত অথবা কঠিন শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো শিশুর বিপজ্জনক উপসর্গগুলো চেনা। নিউমোনিয়া আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন শিশুদের জন্য সঠিক চিকিৎসার সহায়তা নেওয়া এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তার সঠিক অ্যান্টিবায়োটিকসহ নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করানো।

বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য খাতে সাফল্য হিসেবে ইপিআই কার্যক্রম (শিশুদের টিকা নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যক্রম) বিশ্বে একটি রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য (এমএনসিএইচ অপারেশন প্ল্যান), ম্যাটারনাল, চাইল্ড রিপ্রোডাকটিভ অ্যান্ড অ্যাডোলসেন্ট হেলথ (এমসিআরএএইচ) অপারেশন প্ল্যান ও জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (এনএসএস অপারেশন প্ল্যান)-এ তিনটি জায়গায় সরকার যথেষ্ট জোর দিয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেলা হাসপাতালকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করেছে বর্তমান সরকার। শুধু নিউমোনিয়ার চিকিৎসা করলেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্তের হার কমিয়ে আনা যাবে না। তাই এক্ষেত্রে তিনটি দিকেই সমানভাবে কাজ করছে সরকার। ১৯৯০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে নিউমোনিয়াজনিত মৃত্যুর হার ৬৭ শতাংশ কমে এসেছে। এক্ষেত্রে টিকাদান কার্যক্রমের অনেক বড়ো অবদান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালে প্রায় ৩৩ লাখ শিশুকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কার দিয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই)।

টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম পর্যন্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামো বিস্তৃত করেছে। নিউমোনিয়াসহ শিশুদের সচরাচর হয়ে থাকে এরকম রোগগুলো যেন মাঠপর্যায়ে সহজে চিকিৎসা করা যায়, সহজে রেফার করা যায়, এজন্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতির আলোকে বর্তমান সরকার ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (Integrated Management Of Childhood Illness) চালু করেছে। মেডিকেল কলেজে ৩য় বর্ষ থেকেই এই পদ্ধতিটি ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়। এটি নিউমোনিয়া শনাক্তকরণ চিকিৎসা এবং শিশুমৃত্যু কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক নির্দেশনায় আমাদের মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা এখন আগের তুলনায় অনেক উন্নত। নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন রোগে শিশুমৃত্যু এখন অনেক কমে গিয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশের আপামর জনগণের কাছে মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজনীয়তা, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে বিশেষভাবে সচেতন করার কাজ করে যাচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই টিকা ও মাতৃদুগ্ধ পানের মাধ্যমে নিউমোনিয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। পাশাপাশি মা ও পরিবারের সবার স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি শিশুর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করবে।

খালিদ হোসেন: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

ডায়াবেটিস

নিয়ন্ত্রণে রাখুন - সুস্থ জীবন উপভোগ করুন

ডায়াবেটিস কি?

ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ। দেহের মধ্যে ইনসুলিনের উৎপাদন এবং তার কর্মধারার কোন সমস্যার ফলেই রোগটি দেখা দেয়। যারা নগর বা শহরে বাস করেন তাদের দৈনন্দিন জীবনে শারীরিক সক্রিয়তা কম। বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়ছে দীর্ঘায়ু মানুষের সংখ্যাও। জনগণ এখন অধিক পরিমাণে কম স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাচ্ছে, অতীতে তারা যা কখনো খায়নি। এই দুটি কারণে পৃথিবীতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশই তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ডায়াবেটিসের লক্ষণ

টাইপ-১ : ডায়াবেটিসের সূচনা হঠাৎ এবং নাটকীয়ভাবেই হয়। তখন যে লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে-

■ ঘনঘন মূত্রত্যাগ ■ অস্বাভাবিক তৃষ্ণাবোধ ■ অতিশয় ক্লান্তিবোধ ও কাজকর্মে উৎসাহহীনতা ■ লাগাতার ক্ষুধা ■ হঠাৎ দেহের ওজন কমে যাওয়া ■ চোখে ঝাপসা দেখা ■ পুন:পুন: রোগ জীবাণু সংক্রমণ।

টাইপ-২ : সূচনা হয় ধীর গতিতে; আর সূচনাপর্বে রোগ নির্ণয় সহজ নয়। টাইপ-১ ডায়াবেটিসের উপরোক্ত লক্ষণগুলো টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের মধ্যেও দেখা দিতে পারে। তবে এদের মধ্যে লক্ষণগুলি তেমন সুস্পষ্ট নাও হতে পারে। টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বহু সংখ্যক রোগীর প্রাথমিক পর্যায়ে কোন লক্ষণই থাকে না এবং রোগটি সূচনা হওয়ার বহু বছর পরেই কেবল রোগ নির্ণয় হয়। এই রোগীদের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের বেলায় রোগ নির্ণয় কালেই তাদের ডায়াবেটিসজনিত নানা উপসর্গের উপস্থিতি ধরা পড়ে।

ডায়াবেটিসের জটিলতা

ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না, তবে এর কার্যকরী চিকিৎসা আছে। উপযুক্ত ঔষধ, যথাযথ সেবাযত্ন এবং চিকিৎসা ও সেই সাথে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন পদ্ধতি অনুসরণ করলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি সক্রিয়, কর্মক্ষম জীবন কাটাতে এবং জটিলতার ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারেন।

ডায়াবেটিসের স্বল্পমেয়াদী জটিলতাগুলো নিম্নরূপ-

■ **কিটোএসিডোসিস-** রক্তে মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ ও কিটোনের উপস্থিতিতে এই জাতীয় সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যায় হঠাৎ অসুস্থ হতে পারেন। অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠতে পারেন। হতে পারেন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত, অতিশয় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত।

■ **পুন:পুন: জীবানু সংক্রমণ-** রক্তে গ্লুকোজাধিক্য থাকলে সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে না।

■ **ওজন হ্রাস-** গ্লুকোজের পরিবর্তে দেহ শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রোটিন ও চর্বিকেই পোড়াতে শুরু করে বলে এই অবস্থা ঘটে।

ডায়াবেটিসের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতাগুলো নিম্নরূপ-

■ **চক্ষুরোগ-** এ থেকে পরিণামে অন্ধত্বও হতে পারে।

■ **নেফ্রোপ্যাথি-** এর ফলে কিডনির পূর্ণ অক্ষমতা দেখা দিতে পারে এমনকি দুটো কিডনিই অকেজো হয়ে যেতে পারে।

■ **নিউরোপ্যাথি-** রক্তসংবহন সমস্যার সঙ্গে একত্রিত হয়ে নিউরোপ্যাথি (নিম্নপ্রত্যঙ্গে বিশেষ করে পায়ে ও পায়ের আঙ্গুলে ক্ষত, ঘা এবং গ্যাংগ্রিন বা পচনশীল ক্ষত সৃষ্টি) হতে পারে।

■ **হৃৎপিন্ড ও রক্তসংবহনতন্ত্রের ব্যাধি -** এই অবস্থায় হৃৎপিন্ড, ধমনী বা শিরা আক্রান্ত হয় এবং করোনারী হৃদরোগ এবং স্ট্রোক এর ন্যায় মারাত্মক জীবন হননকারী জটিলতা দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ

টাইপ-১ ডায়াবেটিসে যারা ভুগছেন তাদের জীবন রক্ষার জন্য প্রতিদিন একাধিকবার ইনসুলিন এর প্রয়োজন হয়।

টাইপ-২ ডায়াবেটিসের রোগীকে রক্তের গ্লুকোজ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় আনার জন্য মুখে ওষুধ গ্রহণ করতে হয়। সেই সাথে কোন কোন সময় ইনসুলিনের প্রয়োজন হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ডায়াবেটিসের জটিলতা প্রতিরোধ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা সাধারণ মাত্রার কাছাকাছি রাখা প্রয়োজন। গবেষণার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে, রক্তের শর্করা এবং রক্তচাপ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিসের জটিলতাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করা সম্ভব-

■ চোখের জটিলতা প্রায় ৭৬% পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব

■ কিডনি রোগের জটিলতা প্রায় ৫০% পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব

■ স্নায়ু রোগ বা নিউরোপ্যাথি প্রায় ৬০% পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব

■ স্ট্রোক এর ঝুঁকি প্রায় ৩৩% পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব।

PSSMRTD

স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকারি পদক্ষেপ

শারমিন ইসলাম

যুগ যুগ ধরে চলে আসছে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের দাবি। কারণ সুপ্রাচীন কাল থেকেই নারী বঞ্চিত হচ্ছে তার অধিকার থেকে। শুধুই যে বঞ্চিত হচ্ছে তা নয়, হচ্ছে নির্যাতিতও। পুরুষশাসিত এ সমাজে 'নারী নির্যাতন' যেন এক বিশাল ব্যাধি। সমাজ ও সভ্যতা এত এগিয়ে যাওয়ার পরও বন্ধ হয়নি এই প্রবণতা। নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা প্রতিরোধে ১৯৮১ সালে লাতিন আমেরিকায় নারীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২৫শে নভেম্বর 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন দিবসটিকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপন কমিটি ১৯৯৭ সাল থেকে এই দিবস এবং পক্ষ পালন করে আসছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর ২৫শে নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এই প্রতিরোধ পক্ষ উদ্‌যাপন করে থাকে।

সামাজিক কুপ্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গি, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, নিরাপত্তার অভাব, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, আইন ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে নারীদের অসচেতনতা, ধর্মীয় চর্চার অভাব, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের ভুল ব্যাখ্যা প্রভৃতি নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ। জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারির মতো বিভিন্ন সংকটে নারীদের প্রতি সহিংসতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন সহিংসতা প্রতিরোধে বর্তমান সরকার প্রণয়ন করেছে বেশ কিছু আইন ও বিধিমালা। তন্মধ্যে রয়েছে– নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) (সংশোধনী ২০২০), পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮, ডিএনএ আইন ২০১৪, ডিএনএ বিধিমালা ২০১৮, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ প্রভৃতি। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১১টি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্প সমন্বিত সেবা প্রদানের ব্রত নিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর, কক্সবাজার, নোয়াখালী, পাবনা, বগুড়া এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৩টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশি ও আইনি সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ইত্যাদি ওসিসি থেকে প্রদান করা হয়। দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মোট ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১০৯ টোল ফ্রি নম্বরে কল করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা পেয়ে থাকেন। ২০২১ সালে তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদির জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তার লক্ষ্যে টোল ফ্রি হেল্পলাইন বিষয়টি মুদ্রণ করা হয়েছে এবং সরকারি

সকল ওয়েবসাইটে ১০৯ আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া স্মার্টফোনে ব্যবহারযোগ্য মোবাইল অ্যাপস 'জয়' তৈরি করা হয়েছে। যখন নারী কিংবা শিশু নির্যাতনের শিকার হতে যাচ্ছে, তখন এই অ্যাপসটিতে ক্লিক করলে তাৎক্ষণিকভাবে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার (১০৯) এবং অ্যাপসে প্রদত্ত ৩টি এফএনএফ নম্বরে জিপিএস লোকেশনসহ ম্যাসেজ চলে যায়। ১০৯ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। নারী ও শিশুদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮টি রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে এসকল সেন্টারের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীগণ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত টেলি কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'সাইকো সোশ্যাল সাপোর্ট ফর করোনাভাইরাস' নামে ফেইসবুকের মাধ্যমে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান চলছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর ব্রশিউর, লিফলেট, প্রকাশনা দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং উল্লিখিত সেবা সংক্রান্ত স্ক্রল, টিভিসি টেলিভিশনে এবং বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল' নামে একটি লিগ্যাল এইড সেল গঠন করা হয়েছে। সপ্তাহে দুইদিন চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে নির্যাতিত দুস্থ অসহায় নারীদের বিনা খরচে আইনগত সহায়তা দেওয়া হয়। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৪০১৫ জন দুস্থ অসহায় নারীকে আইনগত সেবা দেওয়া হয়েছে এবং আদালতে মোকদ্দমা দায়েরের লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে ১৫৮টি অভিযোগ। মোহরানা ও খোরপোশ বাবদ বিবাদীর কাছ থেকে বাদিনীকে আদায় করে দেওয়া হয়েছে ৯৫,২২,৯৫০ টাকা। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুস্থ অসহায় নারীদের আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থায় জাতীয় মহিলা সংস্থা মনোনীত দুইজন আইনজীবী তালিকাভুক্ত আছেন। নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধকল্পে এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় মহিলা সংস্থার ৬৪টি জেলা ও ৫০টি উপজেলা শাখায় প্রশিক্ষণার্থী, ঋণ গ্রহীতা এবং এলাকার নারীদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৮৮৩২টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ২,১৯,২১১ জন নারীকে সচেতন করা হয়েছে। যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৭৭২৯টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ১,৫২,১৬৭ জন নারী ও যুবাকে সচেতন করা হয়।

নারীর প্রতি শতকরা ৮০ ভাগ সহিংসতা ঘটে পরিবারের ভেতরে। নারীদেরকে সকল প্রকার সহিংসতা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নির্ভরশীল। এ থেকেই বোঝা যায়, নারীরা আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সোচ্চার হতে হবে নারীদেরকেও। নিজের কথা বলতে হবে, নিজের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। নির্যাতনকারী সমাজের যে-ই হোক না কেন, ভয়ভীতি দূর করে জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে হবে। সচেতন হতে হবে শিক্ষায়, চিন্তায় এবং নিজের প্রকৃত অধিকার প্রসঙ্গে। নারীকে 'নারী' নয়, যখনই তাদের 'মানুষ' হিসেবে দেখা হবে, তখনই নির্মূল হবে নারীর প্রতি সহিংসতা নির্যাতন। তাই সকলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনয়ন একান্ত জরুরি।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২২

এ বছর বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২২ পেয়েছে সাত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। ২৫শে অক্টোবর তথ্য ভবনে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এ পদক তুলে দেন।

এবার প্রতিষ্ঠান হিসেবে *দৈনিক যুগান্তর* ও খুলনার *দৈনিক পূর্বাঞ্চল* পদক পেয়েছে। আর গ্রামীণ সাংবাদিকতায় *দৈনিক ভোরের কাগজের* সোনাগাজী প্রতিনিধি সৈয়দ মনির আহমদ, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় *বাংলা ট্রিবিউনের* সিনিয়র রিপোর্টার মো. শাহেদুল ইসলাম (শাহেদ শফিক), নারী সাংবাদিকতায় *বিটিভির* রিপোর্টার তুলনা আরফিন, আলোকচিত্র সাংবাদিকতায় *দি নিউ এজের* স্টাফ ফটো সাংবাদিক মো. সৌরভ লস্কর পদক পেয়েছেন। এছাড়া বরেণ্য ও প্রথিতযশা সাংবাদিক *দৈনিক সংবাদের* সাবেক সম্পাদক বজলুর রহমান আজীবন সম্মাননা (মরণোত্তর) পদক পেয়েছেন। তার পক্ষে এ সম্মাননা গ্রহণ করেন তার স্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সাল থেকে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক দেওয়া হচ্ছে। শুরুতে ছয়টি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় পদক। ২০১৯ সাল থেকে আঞ্চলিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা নামে আরও একটি ক্যাটাগরি নতুন যোগ করা হয়। প্রথম দুবছরে প্রতি ক্যাটাগরিতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, একটি সনদপত্র ও একটি ক্রেস্ট দেওয়া হয়েছে।

২০২০ সাল থেকে আজীবন সম্মাননা, প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা ও আঞ্চলিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্মাননা ক্যাটাগরিতে এক লাখ টাকা, একটি সনদপত্র ও একটি ক্রেস্ট দেওয়া হয় এবং বাকি চারটি ক্যাটাগরিতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, একটি সনদপত্র ও একটি ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: আরাফাত রহমান

সমবায় পরিক্রমা ও বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন

প্রশান্ত দে

সমবায় হলো সমমনা মানুষের স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন, যা নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যাবসা পরিচালনা করে। একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান এমনও হতে পারে যেখানে ব্যাবসাটি এর সুবিধাভোগী সকলে সমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তারাই এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।

বাংলাদেশে নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার পালিত হয় 'জাতীয় সমবায় দিবস'। ১৯৭২ সাল থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এ বছর ৫১তম 'জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২'-এর প্রতিপাদ্য– 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'। জাতীয় সমবায় দিবস পালনের পাশাপাশি এদিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০১২ সাল থেকে ১০টি ক্যাটাগরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কারও প্রদান করা হয়।

গ্রাম্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে সমবায়ের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস রয়েছে। স্বল্প পরিসরে সমবায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি– ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ১৮২১ সালে রবার্ট ওয়েন ইংল্যান্ডের 'নিউ লানার্ক' নামক শহরে ও তার আশপাশের শ্রমিকদের সংগঠিত করে সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত আধুনিক সমবায় আন্দোলনের জয়যাত্রা শুরু হয় ১৮৪৪ সালের ১৪ই আগস্ট ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের নিকটবর্তী রচডেল নামক একটি ছোট্ট শহরে। পরবর্তীতে ১৮৯৫ সালের আগস্ট মাসে সফলভাবে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হয়, যার নাম দেওয়া হয়– International Cooperative Alliance। উক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা সমবায়ীদের ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে। ১৯০৪ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন 'সমবায় ঋণদান সমিতি আইন ১৯০৪' জারি করেন এবং তদানীন্তন ভারত সরকার পুনরায় নতুন করে 'সমবায় সমিতি আইন ১৯১২' জারি করেন। ফলে দেশের সর্বত্র কৃষি ক্ষেত্রে ও অকৃষি ক্ষেত্রে সসীম ও অসীম দায়বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে শুরু করে। পরবর্তীতে এ উপমহাদেশে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পূর্ববর্তী সময়ে সমবায় বিষয়ক বিভিন্ন কমিটি প্রণয়ন, আইন জারি ও প্রয়োগ করা হয়। সমবায় আন্দোলনের তত্ত্বগত উৎস সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায় রবার্ট ওয়েন, লুইস ব্ল্যাঙ্ক, চার্লস ফোরিয়ার এবং অন্যান্যদের লেখা থেকে।

১৯৫৬ সালে ড. আখতার হামিদ খান প্রায়োগিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুমিল্লার কোটবাড়িতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। তার উদ্যোগে ১৯৬০ সালে কুমিল্লার কোতয়ালী থানায় 'দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি' চালু করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (KTCCA) গঠন করার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচি চালু করা হয়। ১৯৬৫ সালে 'কুমিল্লা জেলা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (CDIRDP) কুমিল্লা জেলার ২২টি থানায় চালু করা হয়। ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা' গৃহীত ও প্রচারিত হয়। ১৯৬২ সালে বাংলাদেশ সমবায় কলেজ ঢাকার গ্রিন রোড থেকে কুমিল্লার কোটবাড়িতে স্থানান্তর করা হয়। এরপর ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯ সালের দিকে সারা জেলাব্যাপী ছোটো এলাকাভিত্তিক কৃষকদেরকে সংগঠিত করে প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েক হাজার কৃষি সমবায় সমিতি। ১৯৭১ সালে 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি' (IRDP) চালু করার মাধ্যমে কুমিল্লাস্থ দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির কার্যক্রম সারা দেশব্যাপী ছড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল 'সমবায়'। এজন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের সংবিধানের ১৩(খ) নং অনুচ্ছেদে সমবায় মালিকানাকে দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধু সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়নভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সহজে এবং সুলভমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তাছাড়া দেশের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে কৃষি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছিল।

১৯৭২ সালের ৩০শে জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

কেননা সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তিলাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যম একত্র করতে পারেন, তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতিগোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্রশিল্প, যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই সমস্ত বড়ো শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।'

এদেশের গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু গণমুখী সমবায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে দেশের দুধের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. (মিল্ক ভিটা) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে বলেছিলেন '... কিন্তু একটা কথা এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বৎসরের প্ল্যানে বাংলাদেশের পঁয়ষট্টি হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ–যে কাজ করতে পারে, তাকেই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে যারা টাউট আছেন তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে।'

সমবায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য 'সমবায় সমিতি আইন ২০০১' জারি করা হয়। ২০০২ সালে ২০০১ সালের সমবায় আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করে 'সমবায় সমিতি (সংশোধিত) আইন ২০০২' জারি করা হয়। এরপর সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও সংশোধিত আইন ২০০২-এর সমর্থনে ২০০৪ সালে 'সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪' জারি করা হয়। গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিক নির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিমালাকে যুগোপযোগী করে 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়।

সংগ্রামী চেতনার আলোকে বঙ্গবন্ধু সবসময়ই মনে করতেন, সমবায় একটি মানবকল্যাণমূলক আর্থসামাজিক উন্নয়ন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। আর বঙ্গবন্ধুর এ ভাবনারই স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘ ২০১২ সালকে আন্তর্জাতিক 'সমবায় বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে।

বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করে। সেখানে কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্যবিমোচন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরও উল্লেখ করা হয়– মৎস্য, দুগ্ধ ও সেবা খাতের মতো ফসল উপখাতেও সমবায় কার্যক্রম চালু করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর 'আমার বাড়ি, আমার খামার প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে মোট ১,২০,১৩৮টি সক্রিয় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং এর উপকারভোগী সক্রিয় সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫২,৪৪,০০০ জন।

দেশে বর্তমানে ১,৯২,৬৯২টি সমবায় সমিতি এবং সদস্য ১,২০,৪২,০৯৫ জনে উন্নীত হয়েছে। এ সকল সমবায় সমিতি শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজিগঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন, বিপণন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নসহ সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিগত মুজিববর্ষে জাতির পিতার গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' করার কাজ চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে দেশের ৯টি জেলার ১০টি গ্রামের মোট পাঁচ হাজার মানুষ এ প্রকল্পের আওতায় আসেন। গ্রামের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত গ্রামীণ জীবনযাপনের সুযোগ ও গ্রাম থেকে শহরমুখী জনস্রোত কমাতে এ প্রকল্প ভূমিকা রাখবে।

সমবায় আন্দোলন বা সমবায়ের কার্যক্রম অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিন দিন ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষি ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণন, মৎস্য চাষ, ইক্ষু চাষ, দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন, তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, চামড়াশিল্প, যানবাহন, আবাসন, মৌচাষসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলো বিচরণ করছে। সমবায়গুলো দেশের গণ্ডি পেরিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য এখন বিদেশেও রপ্তানি করছে। মোটকথা সমবায় আন্দোলন দেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তাই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনাকে পাথেয় করে ইতিবাচক মানসিকতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আসুন– বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনকে 'সোনার বাংলা' গড়ার হাতিয়ার হিসেবে যথার্থ অর্থে কাজে লাগাই; আর উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তির অপরিহার্যতা প্রমাণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি।

তথ্যসূত্র

সমবায় অধিদপ্তর

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও অর্ধশতাব্দীর সমবায় আন্দোলন, ড. জাহাঙ্গীর আলম

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও আজকের বাংলাদেশ, সমীর কুমার বিশ্বাস

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ও কৃষিক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা, সাজ্জাদুল হাসান

প্রশান্ত দে: প্রাবন্ধিক

দুর্নীতিকে না বলুন

দুর্নীতিকে না বলো
সৎপথে এগিয়ে চলো

মামলা

মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

পড়ন্ত বিকেল। লাল হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের সূর্য। গরমকাল হলে এ সূর্যের শেষ আভায় উত্তাপ মিলত। এখন শীতকাল, রোদে উত্তাপ নেই। পথে পথে রাস্তার ওপর নিস্তেজ ছায়া আছে শুধু। গরম বা শীত, যাই হোক না কেন গোধূলি বেলায় মুন্সিরহাটে থাকেন এমদাদ হোসেন। মনসুরের চায়ের দোকানে বুড়োদের আড্ডা জমে। কথার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপ খালি হয়, সিগারেটের কালচে ধোঁয়া বাতাস ভারী করে। এমদাদ হোসেন চা-সিগারেট কিছুই খান না। এসবে তার নেশা নেই। তিনি পানপ্রিয় মানুষ। চিকিৎসকের কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে চা-সিগারেট-পানের ওপর। সব উপেক্ষা করে প্রতিদিন খিলি-খিলি পান খান। কদিন আর বাঁচবেন। বুড়ো বয়সে বিকেলের সময়টুকু আড্ডা-গল্পে ভালোই কাটে।

প্রতিদিন উত্তরগ্রাম থেকে ইদ্রিস আখন, আজিজ মাস্টার আসেন। আর ক্রাচে ভর করা ইব্রাহিম মাঝি। এদের সঙ্গেই আড্ডা, সেই শৈশবের সঙ্গী। এমদাদ হোসেন প্রতিদিন অপেক্ষা করেন কখন সূর্যিটা পশ্চিমে হেলবে। তার জীবন অবশ্য আরামের। কাজকর্ম থেকে ইস্তফা দিয়েছেন অনেক আগে। এখন ছেলে দুজন ভালোই কামাই করে। তাকে সাপ্তাহিক হাতখরচ দেয়। স্ত্রী মিনারা নেই। প্রভুর ডাকে চলে গেছে বহু বছর হলো। মৃত্যুর হিসাব তিনি রাখেন না। অবশ্য এখন বয়স হয়েছে, প্রায়ই স্মৃতিভ্রম হয়। এক কথা তিনি দু'তিনবারও বলেন। পুত্রবধূরা শ্বশুরের বিস্মৃতিতে ভ্রু কুঁচকায়। আড়ালে আবডালে বিরক্তি দেখায় হয়ত। বৃদ্ধ বয়স তো করুণার। সবার কপাল তার মতো নয়। বন্ধুদের অনেকেই স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের তীর্যক কথা শোনে। কখনও গালাগাল। বুড়োদের কেউ কেউ এসব গায়ে মাখে, নিভৃতে কাঁদে। এমদাদ হোসেন সামান্য মন খারাপ করেন। কিন্তু চোখে অশ্রু আসে না। কান্না তিনি একাত্তরেই ভুলেছেন। কত তাজা প্রাণ চোখের সামনেই নিভে গেছে, কত রক্ত মিশে গেছে মাটিতে, বাতাসে ছড়িয়েছে অপ্রত্যাশিত গন্ধ। তিনি নির্লিপ্ত থেকেছেন। প্রাণের বন্ধু ছিল মতিন কায়েস। চোখের সামনে গুলিতে ছিটকে গেল ওর মগজ, মতিন মা বলেও ডাকতে পারল না একবার। কী আশ্চর্য! মুহূর্তেই সব ঘটে গেল চোখের সামনে। এমদাদ হোসেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু কাঁদেননি। দেশের জন্য যে প্রাণ গেছে তার জন্য কাঁদবেন কেন? এমদাদ হোসেন এমন পোড়-খাওয়া মানুষ। বউদের বিরক্তি-অবহেলায় তার অশ্রুচোখ হবে না। যতদিন বাঁচবেন খুশি মনে বাঁচবেন।

দুপুরবেলা থেকেই এমদাদ হোসেন ভাবছিলেন আজ হাটে যাবেন কি না। ছোটোবউ ইতস্তত। গতকাল বলেছিল, 'আব্বা আপনের তো বয়স হইছে। ঘরে থাকবেন আর আল্লারে ডাকবেন। আপনে এই বয়সে দোকানে গল্পগুজব করেন। মাইনসে কত কী কয়...।' মানুষ 'কী কয়' তা আর পুত্রবধূকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়নি। নিজের ভালোলাগা অন্যের কথায় বিসর্জন দেওয়ার কোনো অর্থ নেই। গতকাল থেকে নিজেকে নিজে কম প্রবোধ দেননি। আজ বিকেল ঘনিয়ে এলেও বাজারের দিকে পা বাড়াননি তিনি। মন থেকে সায় পাচ্ছিলেন না। তারপরই মনে পড়ল আজগরের কথা। ইদ্রিস আখন বলেছে সে বহুকাল পর ঢাকা থেকে এসেছে। আজ বাজারে আসবে। এমদাদ হোসেনের মন আনচান করে। একাত্তরের সেই আজগর মিয়া। কত স্মৃতি!

বিছানার নীচে টাকা রাখেন এমদাদ হোসেন। যৌবনকাল থেকে এই অভ্যেস। শেষ বয়সেও তা ছাড়তে পারেননি। এই মাসে বিছানার নীচে বিশ হাজার টাকা জমেছে। সবটাই ছেলে-মেয়েদের দেওয়া। চার হাজার টাকা পাঞ্জাবির পকেটে পুরে বাজারের দিকে পা বাড়ান। আগে বাজারের রাস্তাটি কাঁচা ছিল, এখন পাকা হয়েছে। এমদাদ হোসেনের ভর দেওয়া লাঠি পাকা রাস্তায় ঠক্ ঠক্ শব্দ বোনে। তার পাশ ঘেঁষে দু'একটা রিকশা যায়। এমদাদ হোসেন ঠিক করেন আজ নতুন কিছু করবেন। সামনে মাঝি বাড়ি। এ বাড়িতে একদল শিশু-

কিশোর আছে। তারা তাকে দেখলে 'দাদাজান' 'দাদাজান' বলে ডাকে। কোমল মুখগুলো থেকে দাদাজান শুনতে এমদাদ হোসেনের ভালো লাগে। চমকপ্রদ ব্যাপারটা তিনি তাদের দিয়ে শুরু করবেন। ছেলেমেয়েরা সাতচাঁড়া খেলছিল। তিনি হাত উঁচিয়ে ডাকতেই শিশুরা দলবেধে এল। এমদাদ হোসেন বললেন, তোমরা কী খেতে চাও দাদাভাইরা? কেবল এই ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি শুদ্ধ করে কথা বলেন। দলের ভেতর গুঞ্জন উঠতে দেরি হয় না। কেউ কেউ এমদাদ হোসেনের পাঞ্জাবি ধরে টানাটানি করে। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাজারে এলেন। যার যে খাবার ও খেলনা পছন্দ, তাকে তা দেওয়া হলো। এতে খরচ হয়েছে তিনশো ছয় টাকা। কিন্তু দলটার সবাই হাসছে। সবার হাতে কিছু না কিছু। তিনি সবাইকে বাড়ি পাঠালেন। তারপর নিজে এসে দাঁড়ালেন মনসুরের চায়ের দোকানে। আজগর মিয়া আসবে ভেবে তিনি রোমাঞ্চিত হচ্ছেন।

লোকটা জড়িয়ে ধরার আগে তাকে খেয়াল করেননি এমদাদ হোসেন। যখন ছাড়লো ততক্ষণে তাদের চারপাশে ভিড় জমে গেছে। দাড়ি-গোঁফওলা লোকটাকে দেখে মনে হলো তাকে চেনেন না। লোকটা হাসি হাসি মুখ করে বলল, চিনেছিস এমদাদ?

এমদাদ হোসেন মাথা নাড়েন। চিনেননি। লোকটা আরও কাছে এসে বলল,

সর্বেষাং মঙ্গালং ভূয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ

সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ॥

এমদাদ হোসেন চমকে উঠেন। তার হাতের লাঠি কেঁপে ওঠে। নিজের অজান্তেই লাইন দুটোর তরজমা করেন: 'সকলের মঙ্গল হোক, সকলে নীরোগ হোক,/সকলে শুভ দেখুক, কেউ যেন দুঃখ না পায়।' এ প্রার্থনা, বাক্যাংশ কেবল তার নয়, ক্যাম্পের সকলেরই ঠোঁটস্থ ছিল। কেউ সংস্কৃত বললে অন্য একজন তার অনুবাদ করত বাংলায়। এবার সবকিছু মনের আয়নায় ধরা দিতে থাকে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রিয় আজগর! চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যার জন্যে প্রথমে চিনতে পারেননি। কত বছর পর দেখা! এমদাদ হোসেন কাঁপা কাঁপা হাতে ঝাঁপটে ধরেন। দুজনের চোখেই আনন্দাশ্রু।

রাতে আজগরকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। আজ সে তার কাছেই থাকুক। অনেক সুখ-দুঃখের কথা জমা আছে। রাত্রে একসঙ্গে ঘুমাবেন, গল্প করবেন। স্মৃতির ডালপালা ছড়াবে। এমদাদ হোসেন হয়ত আবারও আপ্লুত হবেন। যুদ্ধের সময় আজগর প্রায়ই বলত, 'বুঝলি দোস্ত, বিয়াশাদি করমু না। বিয়াশাদি সবার লাগি না। কপালে জোটে না। আমার কপাল মন্দ।'

এমদাদ হোসেন কিংবা ক্যাম্পের কেউ তার কথাকে সুতোয় গাঁথত না। নিজেদের জীবনে কষ্টের পরিমাণও তো কম নয়। বরং সহ্যের সীমানা ছাড়িয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল বাতাস। তাই আজগরের দুঃখ একান্তই তার ছিল। তার গল্পটাও দুঃসময়ের, দুর্দিনের।

১৯৭০ সাল। কয়েকদিন আগে ঢাকায় উঠেছিল আজগর। চাকরি পেয়েছে মরিচের আড়তে। বয়স তখন ত্রিশের ঘর পার করেছে। কিন্তু বিয়ে-থা করে থিতু হওয়া সম্ভব হয়নি। মেয়ে অবশ্য ঠিক করা ছিল। একই গ্রামের ফাহমিদা। কেবল চাকরির জন্য বিয়েটা আটক ছিল সামাজিক কারাগারে। চাকরিহীন বিয়ে অশান্তি ডাকবে। তাই আজগরও এগোয়নি। আড়তে চাকরি পাওয়ার পর ভেবেছে, এবার গ্রামে ফিরেই ফাহমিদাকে ঘরে তুলবে সে। যথাসময়ে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু সংসার আর হয়নি। দেশে তখন মরণপণ যুদ্ধ লেগে গেছে। আজগর যুদ্ধে। তারপরেই একদিন এল সেই দুঃসংবাদ। হানাদাররা ধরে নিয়ে গেছে ফাহমিদাকে। কেউ তার খোঁজ জানে না। আজগরের রাতের পর রাত কাটে আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায়। একবার মনে হয়, সে নিজে ছুটে যায় পাকিস্তানি ক্যাম্পে। কিন্তু বাস্তবতা তাকে যেতে দেয় না। এভাবে মাস পার হয়, স্ত্রী ফেরার সংবাদ আজগর পায় না।

এতদিন পর এসে আজগর হয়ত আজ সেই পুরানো ঘটনাটিই বলবে এমদাদ হোসেনকে। ভারী কণ্ঠে আর্তনাদ শুনতে শুনতে রাত আরও গভীর হবে। নিস্তব্ধ হবে পললিত গ্রাম। পানের থালার মতো চাঁদ উঠবে আকাশে। ডানা ঝাঁপটাবে রাতজাগা পাখি। তবু কথা শেষ হবে না। রাত শেষ হবে। তখনও জেগে থাকবেন দুজন মুক্তিযোদ্ধা!

অবশ্য এমদাদ হোসেনের ভাবনার ধার ধারেনি আজগর। রাতে কোনো পুরানো কথা বলেনি সে। জানিয়েছে নিজের একটি তীব্র ইচ্ছের কথা। যে কারণে এতকাল পরে সে গ্রামে ফিরেছে। তার কথা শুনে দুশ্চিন্তায় এমদাদ হোসেনের মাথাটা নুয়ে আসে। বোবার মতো চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকে দুজনে। এমদাদ হোসেন ভাবছেন, এই বুড়ো বয়সে এসব কি আর সইবে? খুন-খারাবিতে যাওয়ার বয়স সেই কবে শেষ হয়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেশের শত্রু এখনও শেষ হয়নি। দেশের ভেতরেই তারা বেঁচে আছে নানা বেশে, নানা আবরণে। যারা ছিল রাজাকার, তাদের আজ কত কী হয়েছে। আজগর খুক খুক কাশে। বয়সের ভারে নুয়ে গেছে দেহ। সে কি পারবে হাসমত মিয়ার সাথে লড়তে? এ কথা বলতেই আজগর মৃদু হাসে। বলে, 'দোস্ত! যুদ্ধ শেষ হইছে সত্য, শত্রুও যে বাঁইচা আছে এটাও সত্য। হাসমত মিয়া তো রাজাকার আছিল। তারে আমি ছাড়ি দিতে পারি না! আমার গেরামে এতদিন পরে আইছি শুধু তার নামে যুদ্ধাপরাধীর একখান মামলা দিতে।'

এমদাদ হোসেন ক্ষীণ গলায় বলতে চেষ্টা করে, 'হাসমত কি আর এখন হাসমত আছে? হেয় অহন সমাজসেবক। তার ডাইন হাত কানা রফিক চিহ্নিত গুন্ডা। পুলিশ অগরে ছুঁইয়াও দেহে না। মামলা করলি তো তোকে মারি ফেলবে।'

আজগর কি আর সেই কথায় কান দেয়। 'জান লাইগলে দিয়ামনি। কুলাঙ্গারগুলার বিচার না হইলে আঁর বাঁচি থাকি লাভ নাই। মামলা সকালেই দিয়াম।'

সারারাত এমদাদ হোসেনের ঘুম হয় না। আজগর ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। হাসমত মিয়া ভয়ংকর লোক। কখন ক্ষতি করে বসবে টের পাওয়া যাবে না। এমদাদ হোসেন কী করবেন বুঝতে পারেন না। ফজরের আজান শোনা যায়। দু-একটা কুকুর ডাকে।

সকালে যখন আজগরের ঘুম ভাঙে তখন নয়টা। নাস্তা খেয়ে এমদাদ হোসেন বলেন, 'আরেকটু ভাববি কি দোস্ত?' আজগর হাসে। পাঞ্জাবিটা টেনে সিধে করতে করতে বলে, 'থানায় যাচ্ছি। মামলা না দিলে রাজাকারগো জয় হবে। মামলা না দিয়ে উপায় নাই। হাসমত আলীর লোকেরা যদি মারিও ফেলায় তয়ও আঁই খুশি আছুইন।'

আজগর আলী গঞ্জের দিকে হাঁটতে শুরু করে। সেখানে থানা, দারোগা, পুলিশ... আর হাসমত মিয়ার চ্যালারা। আজগরের হাঁটা আরও দ্রুত হয়। এমদাদ হোসেন নির্বাক বনে যান। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই জোরে আজগরকে ডাকেন, 'দোস্ত খাড়াও, আঁইও আইতাছি।'

হেমন্তের চোখ

কামাল বারি

জলে জলে সাঁতরায় বৃক্ষছায়া– মায়াবী দর্পণে–
শুভ্র বালিকার মুখ ভাসে, দূরে– দিঘল রোদ্দুরে;

মেঘের শরীরে ফিনফিনে জরিন-গরদ-শোভা;
খ'সে খ'সে পড়ে কানফুল– কাঁচাঘ্রাণ– ভুর ভুর;
ঢুলু ঢুলু হেমন্তের চোখ– ধানে ধানে ভারাতুর;
মৃদু বাতাসে উদাস ঘ্রাণের অঘ্রান– মনলোভা;

চোখের পল্লবে জল– শিশিরদানা জ্বলছে সুখে;
বিলের জলে শ্যাওলা ভাসান– মৎস্যগন্ধা প্রাণ;

আহা, এই মৃদু শীতে–গীতে সংগীতে উঠুক ভ'রে
জীবন! এই যে আয়ু– আমাদের পলল ভূমির;
নবান্নের ঘ্রাণে, প্রাণ এখানে, নিতুই পল্লবিত;
আমাদের ছাড়াছাড়ি নেই– থাকি গলাগলি ধ'রে।

জাতীয় চার নেতা

মঈনুল হক চৌধুরী

জাতীয় চার নেতার কথা
বলছি শোন ভাই,
দেশের জন্য তাঁদের ত্যাগের
তুলনা তো নাই।

তাঁরা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর
অতি আপন প্রিয়,
দেশকে ভালোবেসে ছিলেন
বলছি– অদ্বিতীয়।

চোখে তাঁদের স্বপ্ন ছিল
দেশকে স্বাধীন করা,
বিশ্বমাঝে বাংলা ভূমি
ঊর্ধ্বে তুলে ধরা।

পঁচাত্তরে জেলখানাতে
শহিদ তাঁরা হন,
তাঁদের শোকে এই বাংলার
ভাঙে সবার মন।

তাঁদের শোকে আরও কাঁদে
আকাশ-বাতাস-মাটি,
জাতীয় চার নেতা ছিলেন
সোনার মানুষ, খাঁটি।

কখনও যে ভুলবো নাতো
আমরা তাদের ঋণ,
ইতিহাসের পাতায় তাঁরা
থাকবে অমলিন।

হেমন্তের গান

রুহুল গনি জ্যোতি

বাতাসে কান পাতলেই শোনা যায় তার আবাহন
বাজছে নূপুরের ধ্বনি গাছের পাতায় পাতায় শিহরণ তার
শিউলির আগমনি গানে দোলনচাঁপার ভাঙে ঘুম
মেঘের আড়ালে জমে ওঠে চাঁদ-জ্যোৎস্নার লুকোচুরি
শীর্ণ নদী ধু ধু বালুচর কাশবনের শ্বেত শুভ্র হাসি
যেন সে মায়াবী ফাঁদ পেতে বসে আছে
আঁচলে তার হৃদয় জড়িয়ে যায় কখন যে পথহারা হয়ে যাই
চিরন্তন এক বাউল যেন একতারা হাতে
গেয়ে ওঠে বুকের গভীরে
বাংলার প্রান্তর জনপদ মেতে ওঠে নবান্নের উৎসবে
হেমন্তের স্নেহের ছোঁয়ায় প্রকৃতি রুক্ষতা হারায়
পাখির কণ্ঠে জাগে মিলনের সুর
ফসলের মাঠ আজ হয়েছে মুখর
এসেছে ঋতুর রানি বাংলার নগরে ও গ্রামে
তারই আগমনি গান চারদিকে হচ্ছে ধ্বনিত।

হেমন্তের গান

শাকিব হুসাইন

ঐ দেখা যায় সবুজ মাঠে
পাকা ধানের রূপ–
হলদে রাঙা শিষগুলো যে
ভালো লাগে খুব।
ঐ দেখা যায় মাঠের মাঠে
শিশির ঝরা ঘাস–
শিশির ঝরা ঘাসের বুকে
ঘাসফড়িঙের বাস।

ঐ দেখা যায় মেঘলাকাশে
সাদা মেঘের নাও–
এই নায়েতে মেঘমেয়েরা
যায় পরিদের গাঁও।
ঐ দেখা যায় ধানের ক্ষেতে
কৃষান চাষির দল–
গান গেয়ে সব ধান কাটছে
করছে কোলাহল।
ঐ শোনা যায় সবুজ বনে
পাখির কলতান–
ভোরে দোয়েল মিষ্টি সুরে
গায় হেমন্তের গান।

হেমন্ত দেয় দোলা

ইমরান পরশ

জোনাক জ্বলা নদীর বুকে চাঁদ দিয়েছে উঁকি
রোদের সাথে ভাব জমিয়ে খেলছে যে টুকটুকি।
ঢেঁকি ছাঁটা চালের পিঠে চালকুমড়ার বড়া।
মন-জোছনায় খুশির ঝরনা স্বপ্নে নড়াচড়া।

চোখ ঘুমঘুম ঢুলু ঢুলু আলতা রাঙা পা-ও
নরম রোদে নাচন তোলে খুকুর সারা গাও।
রোদ ঝুরঝুর মেঘের বাড়ি বিন্নি ধানের খই
আদুল-আদুল পাতিহাঁসের একটানা হইচই।

নরম নরম রোদের খেলা নৌকাতে পাল তোলা
মন পবনে নাও ভাসিয়ে হেমন্ত দেয় দোলা।

হেমন্ত

সৈয়দ হোসেন

ঋতুরানি হেমন্ত নিয়ে আসে শীতল হাওয়া
মাঠে মাঠে ধানের শিষে ঢেউয়ের খেলা।
শিশিরভেজা দূর্বা, ফুলের সুরভি ডালা
হেমন্তে শ্বেতশুভ্র কাশফুলের অপূর্ব দোলা।
মাঠভরা সোনালি ধান, মিষ্টি-সূর্যের হাসি
রাখালিয়া মধুর গান, মোহিত সুরে বাঁশি।
কৃষকের অনাবিল হাসি, ধানের ম ম ঘ্রাণ
চলে বাংলার বাউলিয়া আর ধানভানার গান।
ঢেঁকির তালে মুখরিত আঙিনা, সাজ সাজ রব
পিঠা-পায়েশে মাতোয়ারা আর নবান্নের উৎসব।

স্বাধীন বাংলাদেশ

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

বাংলাদেশ বাংলাদেশ রূপে-গুণে বেশ,
তোমায় সৃজিতে কত দামাল ছেলে
কত না এলোকেশী বীরাঙ্গনা হলো নিরুদ্দেশ।

পাকিস্তানি দোসর ওরা আলবদর, আলশামস,
আত্মভুলে সেদিন দিয়েছিল থাবা
কেড়ে নিতে স্বীয় বাংলাদেশের শ্বাস।

রণাঙ্গনে বীর বাঙালি করেনিকো কোনো ভয়,
সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে
দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেঙে ছিনিয়ে এনেছে বিজয়!

মুক্তিফৌজ-গেরিলা সেদিন মানেনি কোনো হার,
শত্রুহননে অগ্রণী থেকে, সকল পথ রুদ্ধ করে
পরাধীন জাতিকে এনে দিয়েছিল স্বাধীনতা উপহার!

স্থল-জল-আকাশ পথে দুর্বার-দীপ্ত-দুরন্ত প্রতিরোধ,
মনোবল ছিল পর্বতসম বাহুতে অঢেল তেজ
চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া করিলো হায়েনাকে পরাভূত।

বীর বাঙালি প্রাণপণ লড়ে শত্রুকে করলো নিঃশেষ,
আত্মসমর্পণ করিলো নিয়াজী হায়েনার দলসহ
বিশ্বমানচিত্রে শোভিত হলো স্বাধীন বাংলাদেশ!

অনিবার্য আধার আমার

মনির জামান

বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনো এক প্রত্যুষে
ঝোঁক বা উত্তেজনার ভেতর রণভঙ্গ বীর
অকস্মাৎ বিস্রস্ত; উষ্ণ হাওয়ায় মুহুর্মুহু
পতঙ্গবৎ পুড়ে যায়
কখনও জলসত্রে মৃতঘাস; ফের গজায়
সেখানে কী আমিও ছিলাম; ক্ষুদ্রপ্রাণ!...
কতবার যে জন্মেছি ত্রিবেণীর ঘাটে ঘাটে
কে জানে ...
আরও কত কত জন্মের অপেক্ষা!

এই
সৃষ্টির
প্রেমের
কামের ওপাড়ে
সর্বংসহা শক্তিমতী
তুমি-ই রুদ্রাণী? মানবী?
আমার সাধনার নির্বাণের অনিবার্য আধার!
চেতনে অবচেতনে মরীচিকাময় আলেখ্য
বর্ণিল বিচিত্র কোনো নারী?
... কিন্তু, কোথায় সে নারী!

অলক্ষ্যে কাছে আসে যে, শেষরাতের চাঁদ হয়ে...
শুঁয়োপোকা থেকে ঘাসফড়িং; প্রজাপতি
কিংবা আরও কোনো বিশদ বর্ণের মিছিলে!
যুগান্তরে আমি যাকে ভালোবেসে মরেছি ...
ভালোবেসে জন্মেছি ...

উষা ও নীলুয়ার চর

নীলিম শেখ রাসেল

উষা!
নীলুয়ার চরের কোনো এক ছোট্ট ঘরে শুভজন্মের তীব্র চিৎকারে
পৃথিবীর বাতাসকে ছন্দে দোল দিয়ে অতঃপর তোমার অস্তিত্ব।
চাঁদের রূপকে ম্লান করে দিয়ে জোছনার হাসি হেসেছো–
বাস্তবতার চরম আঘাতের ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে।
পাড় ভাঙা নদীর গর্জন শুনে,
উড়ন্ত চিলের নকশি করা অবাধ ঘোরাঘুরির জাল দেখে–
স্বপ্নহীন তুমি নগর রচে গিয়েছো নিজের শরীরের আনাচকানাচে,
আর আড়াল চোখে তাকাতাকি করছিল বুকের উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু;
অবশেষে জানলে, তুমি কিশোরী বটে
তাই সূর্য স্পষ্টভাবে তোমায় দেখতে চায়।

উষা!
অপরূপ নীলুয়ার চর, হয়ে গেল স্মৃতি
তুমি নীরবে নদীর স্রোতোধারা, পাহাড়ের ঝরনাধারা সবকিছু ফেলে,
চলে এলে নির্বাক পাথরের শহরে;
সেখানে চালতার ফুল ফোটে না, শিউলি ফুল কারো কদমবুচি করে না
নক্ষত্রেরা বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে,
অলিভ পাতারা মেঘমালায় মুকুট পরিয়ে দেয়
আপন কক্ষপথে পড়ে থাকে সন্দেহের জাল,
রাত্রিরা আলোর ফুল না ফুটিয়ে তীব্র চিৎকারে–
আলকাতরার পোশাক পরিধানে এক্রেসিয়াসের শিষ্য হয়।
তুমি এ কোথায় এলে?

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় নিরাপদ সড়ক ২০২২

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সড়কে নিরাপত্তা কার্যক্রম টেকসই করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সড়কে নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবছরও ২২শে অক্টোবর সারা দেশে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য– 'আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি'– বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো এবং যুগোপযোগী পরিবহণ সেবা টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একটি দক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সরকার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের পাশাপাশি আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনেরও কর্মপ্রয়াস চলমান আছে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু এ লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে ২৭শে অক্টোবর ২০২২ ঢাকায় বঙ্গভবনে বাংলাদেশে ভারতের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার Pranay Kumar Verma পরিচয়পত্র পেশ করেন– পিআইডি

পুলিশকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে নবনিযুক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বিপিএম (বার), পিপিএম সৌজন্য সাক্ষাৎকালে নতুন আইজিপিকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, পুলিশকে সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে, জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভবনে সাক্ষাৎকালে নতুন আইজিপি দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা কামনা করেন।

যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, প্রাণচাঞ্চল্যে উৎসারিত যুবসমাজ দেশ মাতৃকার মূল চালিকাশক্তি। যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সাহসী, অদম্য প্রতিশ্রুতি এবং সৃজনশীল। তাই যে-কোনো দেশের জন্য যুবসমাজ অতি মূল্যবান সম্পদ। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে বলীয়ান এদেশের যুবসমাজ মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামসহ বিভিন্ন সংকট উত্তরণে যুবসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। ১লা নভেম্বর 'জাতীয় যুব দিবস ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন।

'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' –এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও 'জাতীয় যুব দিবস ২০২২' উদ্‌যাপিত হয়। এসময় রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ, যার বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩৫ বছর। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের ধারা অব্যাহত থাকবে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনসহ বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে এ জনমিতিক সুবিধা (Domographic Dividend) কাজে লাগাতে হবে। আমাদের যুবসমাজকে পরিপূর্ণ দক্ষ, আধুনিক ও সচেতন রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের অনেকেই আজ সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা অনেকে বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে এবং দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। একটি জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত ও আদর্শ যুবসমাজ জাতির মেরুদণ্ড। কাজেই যুবদের অবস্থান হবে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। দেশের মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য ও মমত্ববোধ সবসময় জাগ্রত রাখতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের তেজোদীপ্ত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ যুবসমাজ স্বর্ণালি অধ্যায় সূচিত করবে– এ প্রত্যাশা করি।

প্রতিবেদন: মিতা খান

পায়রা বন্দরের উন্নয়ন প্রকল্প উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা সমুদ্রবন্দরকে বিশ্বমানের করতে ১১,০৭২ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে– বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিং, আটটি জাহাজের উদ্‌বোধন, প্রথম টার্মিনাল এবং ছয় লেনের সংযোগ সড়ক ও একটি সেতু। ২৭শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বন্দরটিকে তার পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করতে সক্ষম করবে এবং দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ করবে, যার সুফল জাতি যুগ যুগ ধরে ভোগ করবে। পায়রা সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এদিকে ২০১৩ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা সমুদ্রবন্দর উদ্‌বোধন করেন। উল্লেখ্য, বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ পর্যন্ত ২৩৬টি সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে এসেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৫৪৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

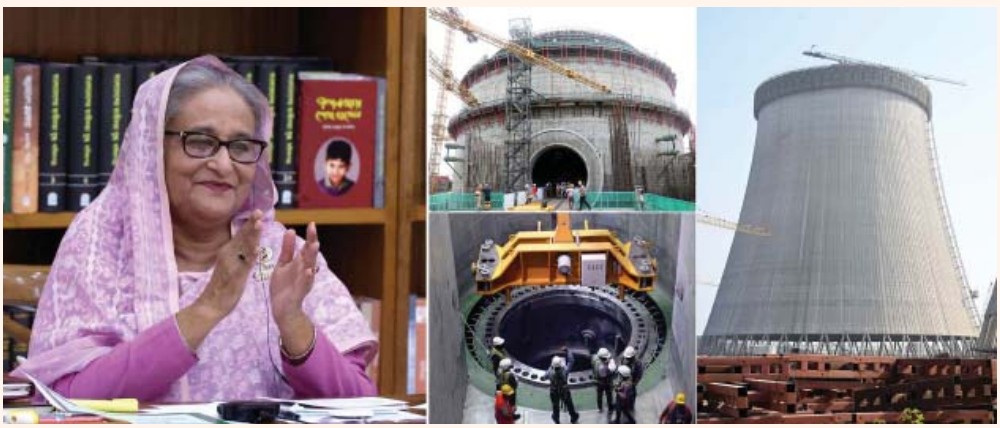

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে অক্টোবর ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাবনার ঈশ্বরদীতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-২ এর রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল স্থান উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। এ কেন্দ্র থেকে মানুষের কোনো ক্ষতি হবে না। এতে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে উত্তরাঞ্চলের মানুষ। এর মাধ্যমে মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি হবে। ১৯শে অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাবনার ঈশ্বরদীতে ২৪০০ মেগাওয়াট রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আরএনপিপি)-এর ইউনিট-২-এর রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল বা পরমাণু চুল্লি পাত্র স্থাপন কাজের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পৃথিবী এখন গ্লোবাল ভিলেজ। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। সে কারণে বিশ্বে যখন অর্থনৈতিক মন্দা দেখা যায়, তার ধাক্কা আমাদের ওপরও এসে পড়ে। আমাদের কিছুটা সাশ্রয়ী হতে হচ্ছে। তার মানে এই নয়, আমাদের বিদ্যুৎ সবাই পাবে না। বিদ্যুৎ সবাই পাবে, পাচ্ছে। তবে কিছুটা মিতব্যয়ী হতে হচ্ছে আমাদের। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে এটা আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা চাই, দেশের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতি। তিনি আরও বলেন, আগামী ২০২৩ সালে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট এবং ২০২৪ সালে দ্বিতীয় ইউনিট উৎপাদনে যাবে।

যার যতটুকু জমি আছে সেখানে কিছু উৎপাদনের চেষ্টা করুন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সারা বিশ্বে যে দুর্যোগের ঘনঘটা তা থেকে বাংলাদেশকে সুরক্ষিত করতে হবে। যে যার অবস্থান থেকে অধিক খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করুন। যার যে জমি আছে সবাই সেখানে কিছু উৎপাদনের চেষ্টা করুন। ১৬ই অক্টোবর ছিল বিশ্ব খাদ্য দিবস। ১৭ই অক্টোবর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২' উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী এ তাগিদ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের অনেক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জায়গা আছে। সেগুলোতে আমরা উৎপাদনের দিকে নজর দেই। খাদ্য গ্রহণেও সাশ্রয়ী হই। যে যা পারি উৎপাদন করি। তাহলে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হবে না। বিশ্বব্যাপী যদি দুর্ভিক্ষ হয়ও, বাংলাদেশ যেন খাদ্যের জোগান দিতে পারে আমাদের এখন সে ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের খাদ্যের সাশ্রয় করতে হবে। আবার যেসব খাদ্য এখন বেঁচে যায়, সেগুলো সঠিক সংরক্ষণ করতে হবে। আমরা উৎপাদন করে যাচ্ছি, কিন্তু সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করতে পারলে অযথাই নষ্ট হবে। সেদিকে এখন নজর দিতে হবে। 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়। ভালো উৎপাদনে উত্তম পুষ্টি, সুরক্ষিত পরিবেশ এবং উন্নত জীবন'–এ প্রতিপাদ্যে এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়।

সেনাবাহিনী পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে দেশের সেবা করবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তরিকভাবে দেশের সেবা করবে। তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেনাবাহিনীর সকল সদস্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতির পিতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা ও পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন, পেশাগত দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সমন্বয়ে নিষ্ঠার সাথে দেশের সেবায় কাজ করে যাবেন। ১৩ই অক্টোবর সাভার সেনানিবাসে সিএমপি সেন্টার অ্যান্ড স্কুলে সদর দপ্তর ৭১ মেকানাইজড ব্রিগেড, ১৫ ও ৪০ ইস্ট বেঙ্গল (মেকানাইজড)

এবং ৯ ও ১১ বীর (মেকানাইজড)-এর পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এসময় তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সেনাবাহিনী দেশের যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং নেত্রকোণা জেলায় আকস্মিক ভয়াবহ বন্যায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনের জন্য আমি সেনাপ্রধানসহ এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, 'অপারেশন কোভিড শিল্ড'-এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সদস্যরা করোনা প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং বিভিন্ন বৈদেশিক মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছেন সম্মান ও মর্যাদা, যা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আবহমানকাল থেকেই যুদ্ধের ময়দানে জাতীয় মর্যাদার প্রতীক 'পতাকা' বহন করার রীতি প্রচলিত আছে। পতাকা হলো জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান এবং মর্যাদার প্রতীক। তাই পতাকার মান রক্ষা করা সকল সৈনিকের পবিত্র দায়িত্ব।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর বক্তৃতা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৮ই অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ আয়োজিত আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন। বক্তৃতার শুরুতেই বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শেখ রাসেলসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, আজ শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যখন শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয় তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। যখন ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে একে একে সবাইকে হত্যা করা হচ্ছিল তখনও শেখ রাসেল কর্মচারী রমা যিনি এখনও বেঁচে আছেন, তার হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। শেখ রাসেল যখন বলেছে, আমি মায়ের কাছে যাবো, তখন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে মায়ের কাছে নেওয়ার কথা বলে ঘাতকরা সেদিন শেখ রাসেলের মতো ছোট্ট শিশুকে হত্যা করেছিল।

তিনি আরও বলেন, যুবলীগ প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর সহধর্মিণী বেগম আরজু মণির লাশ যখন মেঝেতে পড়েছিল, ফজলে শামস পরশের বয়স তখন পাঁচ বছর এবং তাপসের বয়স সাড়ে তিন বছর। পরশ মা-বাবা হারানো কিছুটা বুঝতে পারলেও তাপস যিনি দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সুযোগ্য মেয়র, মায়ের লাশ ধরে ধরে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে বলছিল, মা ওঠো ওঠো। মা-বাবা যে তার চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে তা সে বুঝতে পারেনি। সেদিন মানবতার বিরুদ্ধে এত নির্মম অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল। আর সেই অপরাধের প্রধান কুশীলব ছিল খোন্দকার মোশতাক। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবার হত্যার পর খুনিদের বিচার বন্ধ করে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি হলো, যখন জিয়াউর রহমান প্রধান সেনাপতি, আর জিয়া ক্ষমতা দখল করার পর পার্লামেন্টে প্রথম অধিবেশনে তার নির্দেশে খুনিদের বাঁচাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করা হলো বর্ণনা করেন তিনি।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, একজন ডাকাতও যদি খুন হয়, একজন খুনিকেও যদি কেউ খুন করে তারপরও সেটার বিচার হয়। কিন্তু হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, যিনি জাতিকে স্লোগান শিখিয়েছেন– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'তুমি কে আমি কে, বাঙালি বাঙালি', যে নেতা হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো বাঙালিকে সেই স্লোগান শিখিয়ে এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে পাঁচ হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে বাঙালির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না! শেখ রাসেলের হত্যার বিচার হবে না, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের হত্যার বিচার হবে না, শেখ কামাল, শেখ জামালের, তাঁর নববধূকে হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না! এভাবে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছিল জিয়াউর রহমান। এসময় সভায় শেখ রাসেলের স্মরণে মঞ্চপর্দায় গান ও আবৃত্তি সম্প্রচার অনুষ্ঠানকে আবেগঘন রূপ দেয়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ২৫শে অক্টোবর ঢাকায় তথ্য ভবন অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল পদক ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

প্রেস কাউন্সিলের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৩রা অক্টোবর সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের নিকট থেকে কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ গ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি বলেন,

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটির উদ্দেশ্য ছিল পাঠক এবং সংবাদপত্রের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ তৈরি হয় সেটি নিষ্পত্তি করা। কোয়াসি-জুডিশিয়াল বডি হিসেবে এটিকে গঠন করা হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি পঞ্চাশ বছর আগের এ প্রেস কাউন্সিল আইনটিকে যুগোপযোগীভাবে কার্যকর করার জন্য সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আলোচনা করে প্রেস কাউন্সিল একটি খসড়া প্রস্তাব দিয়েছে, সেটি মন্ত্রিসভা হয়ে ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে গেছে। এরপর আবারও ভেটিং হবে।

গত ১৩-১৪ বছরে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, সেটির সাথে নানাবিধ সমস্যা, জটিলতাও তৈরি হয়েছে বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, নিবন্ধন নেই এমন অনলাইন পত্রিকাকে সাংবাদিক নামে পরিচয়পত্র দিতে দেখা যায়, অনেক পত্রপত্রিকা আছে যেগুলো বের হয় না, সাংবাদিকদের নিয়োগ দেয় কিন্তু বেতন দেয় না, সেগুলো আমরা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু করেছি। অংশীজনদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সাংবাদিকদের একটা ডেটাবেজ তৈরি করার জন্য প্রেস কাউন্সিলকে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কীসের ভিত্তিতে এই তালিকা হবে তার নীতিমালার খসড়া তৈরি হয়েছে। এই উদ্যোগ আমরা সরকারের পক্ষ থেকে নেইনি। বিভিন্ন সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান, সমিতি, সংগঠনই এ দাবি উপস্থাপন করেছে। কারণ কিছু মানুষ সাংবাদিক নাম নিয়ে মানুষকে হয়রানি করা– কাজের সাথে লিপ্ত হয়, আর দোষটা পুরো সাংবাদিকসমাজের ওপর বর্তায়, যেটি ঠিক নয়, সমীচীন নয়।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

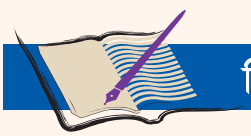

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি প্রাথমিকের শিক্ষক বদলি নীতিমালা সংশোধন

১১ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সমন্বিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলি নীতিমালা আবার সংশোধন করা হয়েছে। ওই নীতিমালার কয়েকটি ধারায় আরোপিত শর্ত শিক্ষকদের সাধারণ বদলি কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছিল। ফলে প্রায় তিন বছর বন্ধ থাকার পর বদলির সুযোগ তৈরি হলেও এর সুফল পাচ্ছিলেন না অনেকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ই অক্টোবর এই নীতিমালা সংশোধন করে জারি করা হয়।

এর আগে ১১ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম খানের স্বাক্ষরে চার পৃষ্ঠার সমন্বিত বদলি নীতিমালা-২০২২ জারি করা হয়। এরই মধ্যে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে নীতিমালা সংশোধনের দাবি ওঠে। শিক্ষক নেতারা জানান, নীতিমালায় ৩.৪ ধারায় বলা হয়েছিল– চারজন বা এর কম শিক্ষক আছেন যেসব বিদ্যালয়ে কিংবা প্রতি ৪০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে মাত্র একজন করে শিক্ষক আছেন, সেখানকার কেউ বদলির আবেদন করতে পারবেন না। সংশোধনীতে এই ধারায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে বলা হয়, এ ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির আবেদন করতে পারবেন এবং তাদের বদলি কার্যকরও হবে। তবে সেখানে নতুন একজন শিক্ষক পদায়ন বা প্রতিস্থাপনের পর। আর অনুপাতের ক্ষেত্রে বলা হয়, বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪০ দুই শিফটের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে (প্রথম ও দ্বিতীয় এক শিফট এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আরেক শিফট) নির্ধারিত হবে যে শিফটে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি সেই শিফটের শিক্ষার্থীর হিসাব অনুযায়ী।

নীতিমালায় আন্তঃজেলা বা উপজেলায় বদলির ক্ষেত্রেও জটিলতা দেখা দিয়েছিল। সংশোধিত নীতিমালায় এ ব্যাপারে বলা হয়, এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় বদলির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশের শর্ত (স্বামী-স্ত্রীর ঠিকানা, বিধবা বা ডিভোর্সের ক্ষেত্রে) ১০ শতাংশের আওতায় পড়বেন না সংশ্লিষ্ট শিক্ষক। বলা হয়েছে, চাকরি লাভের আগে বা পরে বিয়ে হয়েছে এমন শিক্ষক স্বামী/স্ত্রী স্থায়ী ঠিকানায় বদলি হয়ে যেতে চাইলে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শূন্যপদের বিপরীতে বদলি করা যাবে। এক্ষেত্রে উপজেলার মোট পদের সংখ্যা ১০ শতাংশ শর্ত প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ শূন্য আসন থাকলেই বদলি হওয়া যাবে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

মৌজার দরে জমি রেজিস্ট্রেশন নয়

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে তুলে দেওয়া হচ্ছে মৌজার দরে জমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি। এর বদলে রেজিস্ট্রেশন হবে মার্কেট বেজড (বাজারভিত্তিক) পদ্ধতিতে। অর্থাৎ যে দামে জমি কেনাবেচা হবে, সে দামেই হবে নিবন্ধন বা দলিল। ৮ই নভেম্বর সংবাদমাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য, জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও রাজস্ব বাড়াতে বাজারভিত্তিক মূল্য পদ্ধতিটি নির্ণয় এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় এফআইডি সচিবকে। মৌজা দর হচ্ছে জমির সর্বনিম্ন একটি দর, অর্থাৎ মৌজা দরের চেয়ে কম দাম দেখিয়ে কেউ জমি কেনাবেচা করতে পারবেন না। মৌজা দর নির্ধারণের কাজটি হয় 'সর্বনিম্ন বাজারমূল্য বিধিমালা' অনুযায়ী। উল্লেখ্য, সারা দেশের বিভিন্ন এলাকার মৌজা দর সর্বশেষ নির্ধারণ করা হয় ২০১৬ সালে, এখনও সেই দরে নিবন্ধন চলছে।

রেমিট্যান্স পাঠাতে চার্জ লাগবে না

রেমিট্যান্স পাঠাতে এখন থেকে আর চার্জ দিতে হবে না প্রবাসী বাংলাদেশিদের। চলমান ডলার সংকটে বৈধভাবে রেমিট্যান্স বাড়াতে এসব উদ্যোগ নিয়েছে ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সংগঠন এবিবি ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যাংকগুলোর সংগঠন বাফেদা। ৬ই নভেম্বর এবিবি ও বাফেদার বৈঠক শেষে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

এখন থেকে ব্যাংকগুলো ১০৭ টাকায় রেমিট্যান্স এবং ১০০ টাকায় রপ্তানি আয় সংগ্রহ করবে। পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুবিধার্থে মওকুফ করা হয়েছে রেমিট্যান্স পাঠানোর চার্জ বা কমিশন ফি। কোনো ধরনের খরচ ছাড়া প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন। একই সঙ্গে ছুটির দিনগুলোতেও এখন রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন প্রবাসীরা। কারণ ছুটির দিনও এক্সচেঞ্জ হাউস

খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এখন বিদেশ থেকে যে– কোনো পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠাতে কোনো ধরনের কাগজপত্র লাগবে না। আবার প্রবাসী আয়ের ওপর আড়াই শতাংশ হারে প্রণোদনা দিচ্ছে সরকার।

এক কূপে ৮ হাজার কোটি টাকার গ্যাস

ভোলায় টবগী-১ অনুসন্ধান কূপে মিলেছে ২৩৯ বিসিএফ গ্যাস। গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রি হিসাব ধরলে যার আনুমানিক মূল্য ৮ হাজার ৫৯ কোটি টাকা। ৩রা নভেম্বর টবগী-১ অনুসন্ধান কূপ খনন শেষে এ তথ্য জানায় জ্বালানি বিভাগ। টবগী-১ কূপ থেকে প্রতিদিন ২ কোটি ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন করা যাবে। আগামী ৩০-৩৫ বছর এই কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করতে পারবে পেট্রোবাংলা। জ্বালানি বিভাগ জানিয়েছে, দেশীয় জ্বালানির উৎস অনুসন্ধানে কাজ করছে সরকার। এ লক্ষ্যে বাপেক্সের তত্ত্বাবধানে গৃহীত প্রকল্পের আওতায় গ্যাজপ্রমের মাধ্যমে গত ১৯শে আগস্ট ২০২২ তারিখে ভোলা জেলার শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের টবগী-১ অনুসন্ধান কূপটি প্রায় ৩৫০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ৩৫২৪ মিটার গভীরতায় খনন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড থেকে টবগী-১ কূপ এলাকাটি আনুমানিক ৩.১৭ কিমি. দূরে অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিক তথ্যাদি এবং ডিএসটি রিপোর্ট অনুযায়ী এ অনুসন্ধান কূপে গ্যাসের সম্ভাব্য মজুত প্রায় ২৩৯ বিলিয়ন ঘনফুট (বিসিএফ)। গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৮০৫৯.০৮ কোটি টাকা যা এলএনজি আমদানি মূল্য বিবেচনায় বহুগুণ।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

২০২৫ সালের মধ্যে দেশে ৫৫৫টি জয় ডি-সেট সেন্টার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে তিনটি ধাপে দেশে ৫৫৫টি 'জয় ডি-সেট সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হবে। এসব সেন্টার উপজেলা সদরের হাব হিসেবে গড়ে উঠবে। ৪ঠা অক্টোবর দেশের তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণ এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জয় ডি-সেট সেন্টার স্থাপনের বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদফতর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। আইসিটি বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. মোস্তফা কামাল এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী শেখ মোহাম্মদ মহসিন স্ব-স্ব পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২৫শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি মিলনায়তনে ৫ম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২২-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, জয় ডি-সেট সেন্টারের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ভৌত অবকাঠামো শক্তিশালী করাসহ ডিজিটাল সেবা আরও দ্রুত জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। জয় ডি-সেট সেন্টারে তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন, গত ১৩ বছরে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছি। এখন এ ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, উদ্ভাবনী, জ্ঞানভিত্তিক, উচ্চ অর্থনীতির স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। উল্লেখ্য, 'জয় ডি-সেট সেন্টার' পাঁচ হাজার স্কয়ার বর্গফুটে নির্মিত হবে। প্রতিটি সেন্টারে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ডেলিভারি, প্রশিক্ষণ ল্যাব, স্টার্টআপ, যুবকদের জন্য প্লাগ ও প্লে স্পেস, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি) এবং সুইচ রুম থাকবে।

বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট পোর্টাল-জাপান ভার্চুয়াল ডেস্কের উদ্‌বোধন

দেশের আইটি খাতে জাপানি বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও দেশীয় আইটি কোম্পানির সঙ্গে জাপানের আইটি কোম্পানির ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়াতে একটি ভার্চুয়াল ডেস্ক চালু করেছে সরকার। এ প্ল্যাটফর্ম দুই দেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি এবং ব্যাবসার সম্প্রসারণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে দেশে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রযুক্তি ও বিপিও ব্যাবসার সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশের পথ সুগম করবে। ১৩ই অক্টোবর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট পোর্টাল জাপান (www.jp.itconnect.gov.bd) শীর্ষক ভার্চুয়াল ডেস্কের উদ্‌বোধন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জুনাইদ আহমেদ পলক ২০৪১ সালে স্মার্ট জাতিতে পরিণত হতে জাপান সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, জাপান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা করছে।

আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রেও তারা একইভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে বলে তিনি আশা করেন। মানুষকে কারিগরি ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে দক্ষ করে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী। তিনি জাপান এবং বাংলাদেশের যৌথভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচি গ্রহণের প্রস্তাব করেন এবং এ ব্যাপারে জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশনকে (জিইটিআরও) উদ্যোগী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

রোবট অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত

২৫শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র-টিএসসিতে উদ্‌বোধন করা হলো তরুণদের অংশগ্রহণে পঞ্চম বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, জ্ঞানভিত্তিক ভবিষ্যতে রোবট মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পাশাপাশি জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী কাজের জন্য বাংলাদেশের শিশুরা রোবট তৈরি করবে। বিশ্বের উন্নত দেশের চেয়ে বাংলাদেশের শিশুরা মোটেই পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ যেন রোবট বানাতে এবং রপ্তানিতে বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে পারে, সে জন্য খুদে রোবটিয়ারদের প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একইসঙ্গে বুয়েটের রোবটিকস ল্যাব যেন তারা ব্যবহার করতে পারে, সে বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে হাতেকলমে শিখতে পারে, সেজন্য স্কুল-কলেজে ১৩ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, জুনিয়র এবং চ্যালেঞ্জ এই দুইটি গ্রুপে এ বছর মোট ৫টি ক্যাটাগরিতে জাতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এগুলো হলো ফিজিক্যাল কম্পিউটিং, ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি, রোবটিকস কুইজ, রোবট গ্যাদারিং এবং রোবট ইন মুভি। জাতীয় পর্বে বিজয়ীদের মধ্য থেকে পরবর্তী সময়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরাই ২৪তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে থাইল্যান্ডের ফুকেটে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, এই শিল্পে বাংলাদেশ পরিবেশগত, পেশাগত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ২৩শে অক্টোবর নিজ অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত মি. এসপেন রিস্টর-সেভেনডনেসের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধ করতে না পারা, বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা এবং দেশে-বিদেশে নানা নেতিবাচক প্রচারের কারণে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সেক্টর বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ২০১১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত কার্যক্রমকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করেন।

মন্ত্রী জানান, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের অংশ হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে 'শিপ ব্রেকিং অ্যান্ড শিপ রিসাইক্লিং রুলস' জারি করে। এছাড়া ২০১৮ সালে 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন' প্রণয়ন করে। সাক্ষাৎকালে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত 'দি হংকং ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি সেফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাউন্ড রিসাইক্লিং অব শিপস ২০০৯' অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মি. এসপেন রিস্টর-সেভেনডনেস বলেন, এই কনভেনশন অনুমোদনের ফলে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাবে। নরওয়ে একটি জাহাজ নির্মাণকারী জাতি। মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাওয়ায় নরওয়েতে প্রচুর জাহাজ রিসাইক্লিংয়ের অপেক্ষায় আছে। বাংলাদেশি ইয়ার্ডগুলো এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে পারে। এজন্য পরিবেশগত ও নিরাপত্তার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে সুখবর

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ আরও কিছু প্রতিকূলতার পরও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি চাঙা। সম্প্রতি ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা 'ইউরোস্ট্যাট' ইইউ জানুয়ারি-জুলাই ২০২২-এর পোশাক আমদানির সর্বশেষ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, সাত মাসে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানির ৪৩.৩৮ শতাংশই হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে। এই সময়ে আয় হয়েছে এক হাজার ৩১৫ কোটি ডলার। একই সময়ে ইউরোপের বাজারে বৈশ্বিক পোশাক আমদানি বেড়েছে ২৪.৭৪ শতাংশ।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্ব থেকে পোশাক আমদানি করেছে পাঁচ হাজার ৬৩৩ কোটি ডলারের এবং বাংলাদেশ থেকে আমদানি করেছে এক হাজার ৩১৫ কোটি ডলারের। এছাড়া একক মাস হিসাবে ২০২১ সালের জুলাইয়ের তুলনায় জুলাই ২০২২-এ বিশ্ব থেকে ইইউয়ের আমদানি প্রবৃদ্ধি হয় ২২.৭২ শতাংশ এবং বাংলাদেশ থেকে ইইউয়ের আমদানি প্রবৃদ্ধি হয় ৩৬.৮৬ শতাংশ।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশের সংখ্যায় বাংলাদেশ শীর্ষে

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশ সদস্য পাঠানোর দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের নারী শান্তিরক্ষীরা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা-সংঘর্ষ কমাতে বিশেষ করে নারী-শিশুর নিরাপত্তা প্রদানে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছেন। ৩০শে অক্টোবর রাজধানীতে আয়োজিত 'ইউনাইটেড নেশনস পুলিশ ডে ২০২২' শীর্ষক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এসব কথা বলেন।

পুলিশের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের ১৫০ জন নারী পুলিশ কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করছেন। ইউনাইটেড নেশনস পুলিশের ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, বিভিন্ন দেশ থেকে আড়াই হাজারের বেশি নারী পুলিশ সদস্য সেখানে কাজ করছেন। অনুষ্ঠানে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের নারী সদস্যরা নিজেদের 'আইকনিক' শান্তিরক্ষী হিসেবে প্রমাণ করছেন।

অস্ট্রেলিয়ায় বর্ষসেরা সংগীত আয়োজকের স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশের সিয়া

অস্ট্রেলিয়ার দ্য আর্ট মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের ইলেকট্রোঅ্যাকোস্টিক বিভাগে এবার বর্ষসেরার স্বীকৃতি পেয়েছেন বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত সংগীত আয়োজক সিয়া আহমেদ। ৮ই অক্টোবর *প্রথম আলো* পত্রিকায় এ সংক্রান্ত একটি সাফল্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার সংগীতাঙ্গনে গীতিকার, সংগীত পরিচালক ও প্রযোজক হিসেবে মেধার পরিচয় দিয়েছেন সিয়া। বাদ্যযন্ত্র, সুর আর প্রযুক্তির নিপুণ সংমিশ্রণে গানের নতুন রূপ দিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠানের জন্যও কাজ করেন সিয়া। সংগীত সংস্থা অস্ট্রেলিয়ান আর্ট অর্কেস্ট্রা, ক্যানবেরা কনটেমপোরারি আর্ট স্পেস, পেরামাসালা এবং ক্যাহুটসের জন্য সংগীত পরিচালনা করেন সিয়া।

সিয়া আহমেদের জন্ম সিডনির প্যারামেটায়, বর্তমানে ক্যানবেরায় বসবাস করছেন। বাংলাদেশের নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় সিয়ার বাবার বাড়ি।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর উপহার জমিসহ ঘর পেল ৫১টি পরিবার

মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া উপহার জমিসহ ঘর পেল নীলফামারী সদরের লক্ষ্মীচাপ ইউনিয়নের ভূমি ও গৃহহীন ৫১টি পরিবার। ২৫শে অক্টোবর ইউনিয়নের দুবাছুরী গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের হাতে জমির দলিলসহ ঘরের চাবি এবং ১৫ কেজি করে চাল তুলে দেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান নূর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেসমিন নাহার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান শাহিদ মাহমুদ, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আবুজার রহমান, সাধারণ সম্পাদক ওয়াদুদ রহমান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শান্তনা চক্রবর্তী, সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনজুরুল মোর্শেদ তালুকদার, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রিয়াজুল ইসলাম, লক্ষ্মীচাপ ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান প্রমুখ।

সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রিয়াজুল ইসলাম জানান, মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে সরকারের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য

আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতাধীন তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় লক্ষ্মীচাপা ইউনিয়নের দুবাছুরী ৫১টি পরিবারকে জমিসহ সেমি-পাকাঘর উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। আনুষ্ঠানিকভাবে ওইসব পরিবারের মাঝে দুই শতক জমির দলিলসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়। এছাড়াও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রত্যেক পরিবারকে ১৫ কেজি করে চাল উপহার প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি পলিনেট হাউস

কৃষিকে বাঁচাতে নতুন নতুন গবেষণা করে থাকে কৃষি বিভাগ। এরই একটি অংশ পলিনেট হাউস। কৃষি বিভাগ বলেছে, জলবায়ু ঝুঁকির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন এই উদ্ভাবন ইতোমধ্যে কৃষকদের মধ্যে সারা ফেলেছে। সবজি চাষসহ আধুনিক কৃষিকাজের জন্য এখন নতুন প্রযুক্তি পলিনেট হাউস-এর জুড়ি নেই। তাই কৃষিতে নতুন সংযোজন হয়েছে পলিনেট হাউস। এর মাধ্যমে শীতকালীন সবজি যেমন গ্রীষ্মকালে উৎপাদন করা যাবে, তেমনি গ্রীষ্মকালের সবজি শীতকালেও উৎপাদন করা যাবে। হাতের মুঠোয় নতুন এই প্রযুক্তি চলে আসায় কৃষককে কোনো

বেগ পেতে হবে না। পলিনেট হাউস প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারী বৃষ্টি, তীব্র দাবদাহ, কীটপতঙ্গ, ভাইরাসজনিত রোগ ইত্যাদির মতো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিরাপদ থাকবে শাকসবজি এবং ফসলসহ সব ধরনের কৃষিপণ্য।

আখ চাষে বিএসআরআই

ঈশ্বরদীতে অবস্থিত বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এখানে আখসহ মিষ্টি জাতীয় ফসলের উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন ও বহুমুখী ব্যবহারের ওপর গবেষণা করা হয়। আখের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এ দেশে মিষ্টি জাতীয় খাদ্যের উৎস চিনি ও গুড় তৈরির শিল্প। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আখের পাশাপাশি সুগারবিট, তাল, খেজুর, গোলপাতা, মধু ও স্টেভিয়া প্রভৃতি মিষ্টি জাতীয় ফসলের ওপর গবেষণা করে আসছে।

খামার ইনচার্জ ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সঞ্জিত মণ্ডল ১৬ই অক্টোবর সংবাদমাধ্যমকে জানান, বিএসআরআই ২৩৫ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে চাষাবাদ যোগ্য জমি ১৫৮ একর। গবেষণা ও খামার বিভাগ এ জমিতে আখ, তাল, স্টেভিয়া, সুগারবিট, খেজুরসহ বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় ফসলের চাষ ও গবেষণা করে থাকে। বিশেষ করে আখের জাত ঈশ্বরদী-৩৪, ঈশ্বরদী-৩৭, বিএসআরআই-৪১ থেকে বিএসআরআই ৪৬ পর্যন্ত জাতগুলো এখানে সর্বোচ্চ পরিমাণে চাষাবাদ করে বীজ উৎপাদন করা হয়। বিএসআরআইয়ের মহাপরিচালক ড. আমজাদ হোসেন বলেন, চিনিশিল্পের উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত আখের ৪৮টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

আমন ক্ষেত রক্ষায় পাচিং পদ্ধতি

আমন ক্ষেতের পোকা দমনে পাচিং পদ্ধতিতে স্বপ্ন দেখছে কৃষকরা। খরচ ছাড়াই ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ থেকে আমন ক্ষেত রক্ষার পদ্ধতি বরগুনার আমতলীতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগে কমেছে কীটনাশকের ব্যবহার। এতে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা। এতে খরচ নেই। বাড়ির গাছ থেকে ডাল কেটে ক্ষেতে পুতে দেওয়া হয়। ওই ডালে বসে পাখিরা ক্ষেতের ক্ষতিকারক পোকা খেয়ে ফেলছে। এতে যেমন আর্থিক উপকার হচ্ছে, তেমনি পরিবেশের সুরক্ষা পাচ্ছে। ক্ষতিকর ঘাসফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গি ও মাজরা পোকার আক্রমণ থেকে আমনের ক্ষেত রক্ষায় পাচিং পদ্ধতি প্রয়োগ হচ্ছে। উপ-সহকারী কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন বলেন, পাচিং পদ্ধতি কৃষকের কৃষি ও পরিবেশবান্ধব একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে আমনের ক্ষেতে কোনো কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না।

প্রতিবেদনঃ জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বন বিভাগে রাজস্ব খাতে বনায়নের রেকর্ড

রাজস্ব খাতে বনায়নের নতুন রেকর্ড হয়েছে ঢাকা বন বিভাগের অধীন গাজীপুরে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে। বিভাগটির অধীন জেলার চারটি রেঞ্জের বিভিন্ন বিটে সর্বমোট ৪৭০ একর বনভূমিতে রাজস্ব খাতে বনায়ন করা হয়েছে। রেঞ্জগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র কাচিঘাটা রেঞ্জেই চলতি অর্থবছরে ২১০ একর বনভূমিতে রাজস্ব খাতে বনায়ন হয়েছে। জবরদখল উচ্ছেদ করে সৃজিত বাগানগুলোতে উপকারভোগী নিয়োগে প্রক্রিয়া চলছে। সুফল প্রকল্পের অধীন বনায়নে টেকসই ও সমৃদ্ধ হচ্ছে গাজীপুরের বনভূমি।

ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থবছরে গাজীপুর রাজেন্দ্রপুর রেঞ্জে ২০ হেক্টর, শ্রীপুর রেঞ্জে ৫০ হেক্টর, কালিয়াকৈর রেঞ্জে ৩৫ হেক্টর ও কাচিঘাটা রেঞ্জে ৮৫ হেক্টর বনভূমিতে অনুন্নয়ন বা রাজস্ব খাতে বনায়ন হয়েছে, অনুন্নয়ন খাতে সৃজিত বাগান বিভিন্ন ধরনের জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদকৃত বনভূমির বড়ো একটি অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি বিগত দিনে কৃষিকাজে ব্যবহার করতেন। গাজীপুরে অনুন্নয়ন খাতে বনায়নের পাশাপাশি টেকসই বন ও জীবিকা বা সুফল প্রকল্পের অধীন প্রতিটি রেঞ্জের বিটগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণির বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা বন বিভাগের অধীন সবচাইতে সম্ভাবনাময় রেঞ্জ কাচিঘাটা। তিনটি বিট নিয়ে পরিচালিত রেঞ্জটিতে জনবল মাত্র ১৩ জন। অথচ এই স্বল্প জনবল নিয়েও চলতি অর্থবছরে রেঞ্জটির শুধুমাত্র কাচিঘাটা সদর বিটে ১৩৫.৮৫ একর বনভূমি বিভিন্ন ব্যক্তির দখল থেকে উদ্ধার করে বনায়ন করা হয়েছে। বনায়নের ফলে মোথাজুরী, মনতলা মৌজাসহ বিভিন্ন মৌজার বনভূমি সবুজে সেজে উঠেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কাচিঘাটা সদর বিটে ২২ হেক্টর সুফল প্রকল্পের বনায়নের পাশাপাশি দুই কিলোমিটার সড়কের দুই দিকে স্ট্রিপ প্লান্টেশন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩৫.৫ হেক্টর বনভূমি সুফল প্রকল্পে বনায়নের পাশাপাশি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২ হেক্টরে সুফল প্রকল্পে বনায়ন হয়েছে।

কাচিঘাটা রেঞ্জ কর্মকর্তা মঞ্জুরুল ইসলাম ১৬ই অক্টোবর সংবাদমাধ্যমকে জানান, কাচিঘাটা সদর বিটে জবরদখল উচ্ছেদ পরবর্তী অনুন্নয়ন খাতে সৃজিত বাগান সম্প্রতি পরিদর্শন করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব একেএম শওকত আলম মজুমদার। তিনি বাগান দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কাচিঘাটা রেঞ্জের বিভিন্ন বিটে কৃষিজমি হিসেবে ব্যবহৃত বনভূমি চিহ্নিত করে বনায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নির্দেশনা মতে জবরদখল প্রতিরোধ, উচ্ছেদ এবং বনায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

প্রতিবেদনঃ সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালন

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২২শে অক্টোবর ষষ্ঠবারের মতো পালিত হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য– 'আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি'। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান দিবসটি উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান

রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য গাজী মোহাম্মদ শাহনওয়াজ ১০ই নভেম্বর ২০২২ টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন– পিআইডি

নূর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালনে জনসাধারণকে সচেতন করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিআরটিএ'র বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে– নিরাপদ সড়ক দিবসে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, শোভাযাত্রা, আলোচনাসভা, সাজসজ্জা, গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সড়কে নিরাপত্তা বিষয়ক পোস্টার, ব্যানার, স্টিকার প্রদর্শনসহ লিফলেট বিতরণ, রোড শো, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেলে দিবসের গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে ৫ হাজার কিমি. দেশের নতুন সড়ক নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গ্রামাঞ্চলে ৫ হাজার কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৭ হাজার কিলোমিটার পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, ১ হাজার ৯০০ মিটারব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করবে। এতে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৯ দশমিক ৪৩ শতাংশে উন্নীত হবে। ২৩শে অক্টোবর বরিশালের জেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ পার করছে অভাবনীয় এক স্বর্ণালি অধ্যায়। বাংলাদেশ পরিণত হয়েছে শান্তি, প্রগতি আর সম্প্রীতির এক মিলনমেলায়। একের পর এক রচিত হচ্ছে উন্নয়নের সাফল্যগাথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ২০১৮ সালে নির্বাচনি ইশতাহারে দেশের প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। এ ঘোষণা অনুযায়ী 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 'আমার গ্রাম আমার শহর' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধাসহ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে উন্নত পরিবেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে প্রতিটি গ্রামে সুপেয় পানি সরবরাহ ও উন্নতমানের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সুস্থ ধারার বিনোদন ও খেলাধুলার জন্য আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতায় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব

কলকাতায় চতুর্থবারের মতো আয়োজিত হলো বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কলকাতার নন্দন-১, ২ ও ৩ হলে প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র। এই উৎসবে প্রতিদিনই দেখা যায় দর্শকের ঢল। শুধুমাত্র *হাওয়া* ও *পরাণ* নয় , *হাসিনা এ ডটারস টেল* থেকে *ন ডরাই* কিংবা *পরাণ* তিন বেলায় ছয় শো সব হাইজফুল। শো শুরুর প্রায় তিন ঘণ্টা আগে থেকে নন্দন চত্বরে রৌদ্রের মধ্যে ৫০০ মিটার লম্বা দর্শকদের অপেক্ষার লাইন বলে দেয় ভালো বাংলা সিনেমার প্রতি দর্শকদের আগ্রহ কমেনি এতটুকুও। ৩০শে অক্টোবর শুরু হয়ে ২রা নভেম্বর পর্যন্ত চলা বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবের দিনগুলোতে শুধুমাত্র বাংলা ও বাংলাদেশি সিনেমার টানে কলকাতার নন্দন চত্বরে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

কলকাতার দর্শকদের দাবি, টলিউডের সিনেমার থেকে ঢাকাই সিনেমা অতীব বাস্তবসম্মত ও সামাজিক। এমনকি অভিনয় দক্ষতায়ও বাংলাদেশের অভিনেতারাও ভালো করছেন। আর তাই বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে বেশি সংখ্যক সিনেমা দেখানোর দাবি জানিয়েছেন দর্শকরা। ইতোমধ্যে দর্শকদের চাহিদা মেনে প্রতিদিন আরও একটি করে শো বাড়াতেও বাধ্য হয়েছে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপদূতাবাস।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কলকাতায় চলমান চতুর্থ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমা দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তাই ব্যাবসা সফল না হলেও কলকাতার দর্শকদের তীব্র উৎসাহ বলে দেয় চতুর্থ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব ঘিরে বাংলাদেশের সিনেমাকে কলকাতায় প্রমোট করার বিষয়ে এবং অবশ্যই দর্শকদের মধ্যে বাংলাদেশি সিনেমার চাহিদা তৈরির বিষয়ে যথেষ্ট সফল বাংলাদেশ সরকার।

গঙ্গা-যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসব

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ মহিলা সমিতিতে ২১শে অক্টোবর থেকে অনুষ্ঠিত হয় ১১ দিনব্যাপী 'গঙ্গা-যমুনা

সাংস্কৃতিক উৎসব ২০২২'। এবারের গঙ্গা-যমুনা সাংস্কৃতিক উৎসবে ছিল শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তন, পরীক্ষণ থিয়েটার হল, স্টুডিও থিয়েটার হল ও সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্য মিলনায়তন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ড. নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে ভারতের ৪টি দল, ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ৪০টি নাট্যদলসহ মোট ৪৪টি মঞ্চনাটক প্রদর্শনী এবং সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্য মিলনায়তনে ১৮টি সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্যদল ও উন্মুক্ত মঞ্চে ৯টি পথনাটক, ১৫টি আবৃত্তি সংগঠন, ১২টি সংগীত সংগঠন, ৭টি নৃত্য সংগঠন, ১০টি শিশুদল এবং একক আবৃত্তি ও একক সংগীত পরিবেশনা নিয়ে নানা আয়োজন।

৯ই নভেম্বর ২০২২ সাফ উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ বিজয়ী বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের সংবর্ধনা ও আর্থিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মাঝে নিজ কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি

৩৫০০ জন শিল্পীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এবারের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে উৎসবের উদ্‌বোধন করেন মঞ্চসারথি আতাউর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে. এম. খালিদ। এছাড়া উদ্‌বোধনী পর্বে সম্মানিত অতিথিগণ বক্তব্য প্রদান করেন। এই আয়োজন চলে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের

হোবার্টের বেলারিভ স্টেডিয়ামে ২৪শে অক্টোবর নেদারল্যান্ডসের সামনে ১৪৫ রানের লক্ষ্য দেয় বাংলাদেশ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান করে টাইগাররা। জবাবে শুরুতেই হোঁচট খায় নেদারল্যান্ডস। ১৫ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি দলটি। ১৩৫ রানে থেমেছে নেদারল্যান্ডসের ইনিংস। ফলে বাংলাদেশ জয়ী হয় ৯ রানে। এদিন তাসকিন আহমেদ ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ২৫ রানে নেন ৪ উইকেট। টি-টোয়েন্টিতে দেশের হয়ে কোনো ম্যাচে দুই উইকেটের বেশি পেলেন এই প্রথম। দারুণ বোলিংয়ে তিনিই জিতলেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার।

বিশ্ব যুব দাবায় বাংলাদেশ হারালো দ. আফ্রিকাকে

আজারবাইজানের নাকচিভান অটোনোমাস রিপাবলিকে ফিদে ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ অনূর্ধ্ব-১৬ দাবা অলিম্পিয়াডের প্রথম রাউন্ডে ৪ঠা অক্টোবর বাংলাদেশ ৩-১ গেম পয়েন্টে দক্ষিণ আফ্রিকা-২-কে হারিয়েছে। বাংলাদেশ দলের দুই ক্যান্ডিডেট মাস্টার মনন রেজা নীড় ও সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ এবং মো. সাজিদুল হক যথাক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার লেভিতান জুদাহ নাথান, এনউইদো খোদানি ও বোসোমা চিশোমোকে হারান।

ফিফকো বিশ্বকাপে বাংলাদেশ রানার্সআপ

বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলা বাংলাদেশের জন্য স্বপ্ন। তবে করপোরেট বিশ্বকাপে রানার্সআপ হয়েছে লাল-সবুজ দল। ৭ই নভেম্বর দুবাই স্পোর্টস সিটির ইন্সপায়ারেটাস স্পোর্টস ডিস্ট্রিক্ট মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে ১-০ গোলে ওমানের কাছে হেরে রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে বাংলাদেশের বান্দো ডিজাইন। সেমিফাইনালে বান্দো টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জর্ডানের দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। নির্ধারিত সময়ের খেলা ৩-৩ গোলে ড্র ছিল। বান্দো ডিজাইন প্রথম ম্যাচে লেবাননের দলের সঙ্গে ৭-২ গোলে জেতে। অধিনায়ক ইমরানুর হ্যাটট্রিক করেন। পরের ম্যাচে নাইজেরিয়ার সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র হয়। গ্রুপের শেষ ম্যাচে স্বাগতিক আরব আমিরাতের সঙ্গে একই ব্যবধানে ড্র করে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেয় বান্দো বাংলাদেশ।

গোল বন্যায় বাংলাদেশের জয়

মেয়েদের সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে গোল বন্যায় ভাসালো বাংলাদেশ। ৭ই নভেম্বর কমলাপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ভুটানকে ৯-০ গোলে হারায় গোলাম রব্বানীর শিষ্যরা। সুরভী একাই ছয় গোল করে। এর আগের ম্যাচে ৮-০ গোলে ভুটানকে হারিয়েছিল রুমা আক্তাররা। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই লাল-সবুজের মেয়েরা মাঠে চুমু খেলেন। ডাবল হ্যাট্রিক করেন সুরভী আকন্দ।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব

গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই

উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান সাংবাদিক তোয়াব খান

আফরোজা রুমা

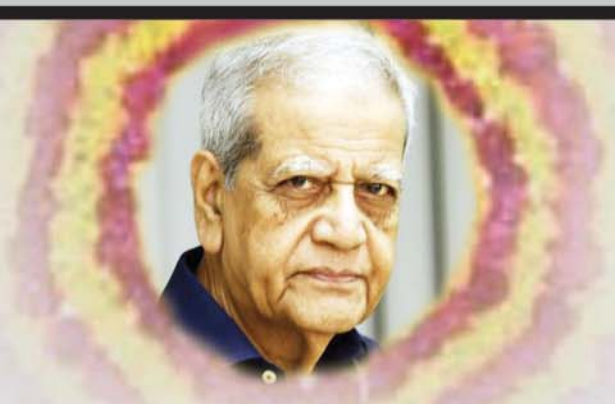

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাবেক প্রেস সচিব, একুশে পদকপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান সাংবাদিক, *দৈনিক জনকণ্ঠের* সাবেক উপদেষ্টা সম্পাদক ও *দৈনিক বাংলার* সম্পাদক তোয়াব খান চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১লা অক্টোবর রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

তোয়াব খান ১৯৩৪ সালের ২৪শে এপ্রিল সাতক্ষীরার রসুলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাংবাদিক মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন তাঁর মামা।

তোয়াব খান পঞ্চাশের দশকে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে *সাপ্তাহিক জনতা* দিয়ে বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের শুরু। ষাট টাকা বেতনে সিনিয়র এপ্রেন্টিস সাবএডিটর ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি *দৈনিক সংবাদ* পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। ১৯৬১ সালে তিনি এর বার্তা সম্পাদক হিসেবে পদোন্নতি পান এবং ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বার্তা সম্পাদক হিসেবে *দৈনিক পাকিস্তান*-এ কাজ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পর *দৈনিক পাকিস্তান* নাম বদলে *দৈনিক বাংলা* হয়। ১৯৭২ সালে *দৈনিক বাংলা* পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ছদ্মনামে লেখা তাঁর 'সত্য মিথ্যা-মিথ্যা সত্য' ও 'সত্যবাক' কলাম আলাদাভাবে পাঠকপ্রিয় হয়েছিল।

দৈনিক জনকণ্ঠ প্রতিষ্ঠার একেবারে শুরুতে উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে তোয়াব খানকে বেছে নেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি *জনকণ্ঠ* বাজারে আসে। তখন থেকে ২০২১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এ পত্রিকায় একই দায়িত্ব পালন করেন তিনি। কর্মময় জীবনের শেষদিকে পুনরায় *দৈনিক বাংলায়* সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন তিনি।

তোয়াব খান ছিলেন ভাষাসংগ্রামী। বাঙালির 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীন বাংলা বেতারে তাঁর লেখা ও পরিবেশনায় 'পিন্ডির প্রলাপ' নামে রাজনৈতিক কথিকা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস এবং মুক্তিকামী মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাঁর হাতে লেখা 'পিন্ডির প্রলাপ' এখন জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত। সাংবাদিকতা ছাড়াও তোয়াব খান সরকার ও রাষ্ট্রের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৩-১৯৭৫ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিব নিযুক্ত হন। বঙ্গবন্ধু নিজে তাঁকে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, পিআইবি'র পরিচালক পদে যোগ দেন। এর পর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৮০-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক ছিলেন।

২০১৬ সালে বর্ষীয়ান সাংবাদিক তোয়াব খান একুশে পদক পান। *দৈনিক বাংলার* সম্পাদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন তোয়াব খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

৩রা অক্টোবর তেজগাঁওয়ের *দৈনিক বাংলা* ও *নিউজ বাংলা* কার্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষীয়ান সাংবাদিক তোয়াব খানের জানাজা শেষে প্রথিতযশা সাংবাদিককে নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে। সেখানে তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হয়। এরপর মরদেহ নেওয়া হয় জাতীয় প্রেসক্লাবে। সেখানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে হয় জানাজা। আসরের নামাজের পর গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদে হয় তৃতীয় জানাজা। সেখান থেকে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতা মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা পাঠাতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 05, November 2022, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd